গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৬
নভেম্বর ২০১৯

নারী সংখ্যা

যদিও যুগে যুগে ভারত তথা বৃহত্তর ভারতের নারীরা মেধা, বুদ্ধিমত্তা, কলা কৌশলী, কর্ম নৈপুণ্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বিশ্বের দরবারে স্বর্ণাক্ষরে তাঁদের নাম লিখে গেছেন; দুর্ভাগ্যবশত, আজও এই পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় এই উপমহাদেশীয় অঞ্চলের বেশির ভাগ স্থানেই তাঁদের যথাযোগ্য স্বীকৃতির অভাব দৃষ্ট হয়। তবে সময়চক্রের দ্রুত আবর্তন হয়েছে শুরু। একবিংশ শতাব্দী এই উপমহাদেশে নারী প্রগতির যুগ হিসাবেই ইতিহাসে গণ্য হবে।

কলম হাতে

সংযুক্তা চ্যাটার্জী, সুভাষ মুখার্জী, অরু ভট্ট, সুচিতা সরকার, কেকা দাস, দোলা ভট্টাচার্য, ডাঃ অমিত চৌধুরী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.:   লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

রবীন্দ্রনাথ লিখে ছিলেন, "আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ...," আমাদেরও তাই। চলতে চলতে 'গুঞ্জন'এর ছয় মাস পূর্ণ হল। এই ছয় মাসের চলার পথে পেয়েছি বহু লেখক-লেখিকার সুনিপুণ লেখার স্বাদ। তাঁদের কলমের খুরধার লেখনী 'গুঞ্জন'কে করে তুলেছে বহুল প্রশংসিত। বিগত শারদ সংখ্যায় এবং দীপাবলি সংখ্যায় পুরানো ও আধুনিক উৎসবের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন ঘটেছে বেশ কিছু গুণী কলমের ছোঁয়ায়।

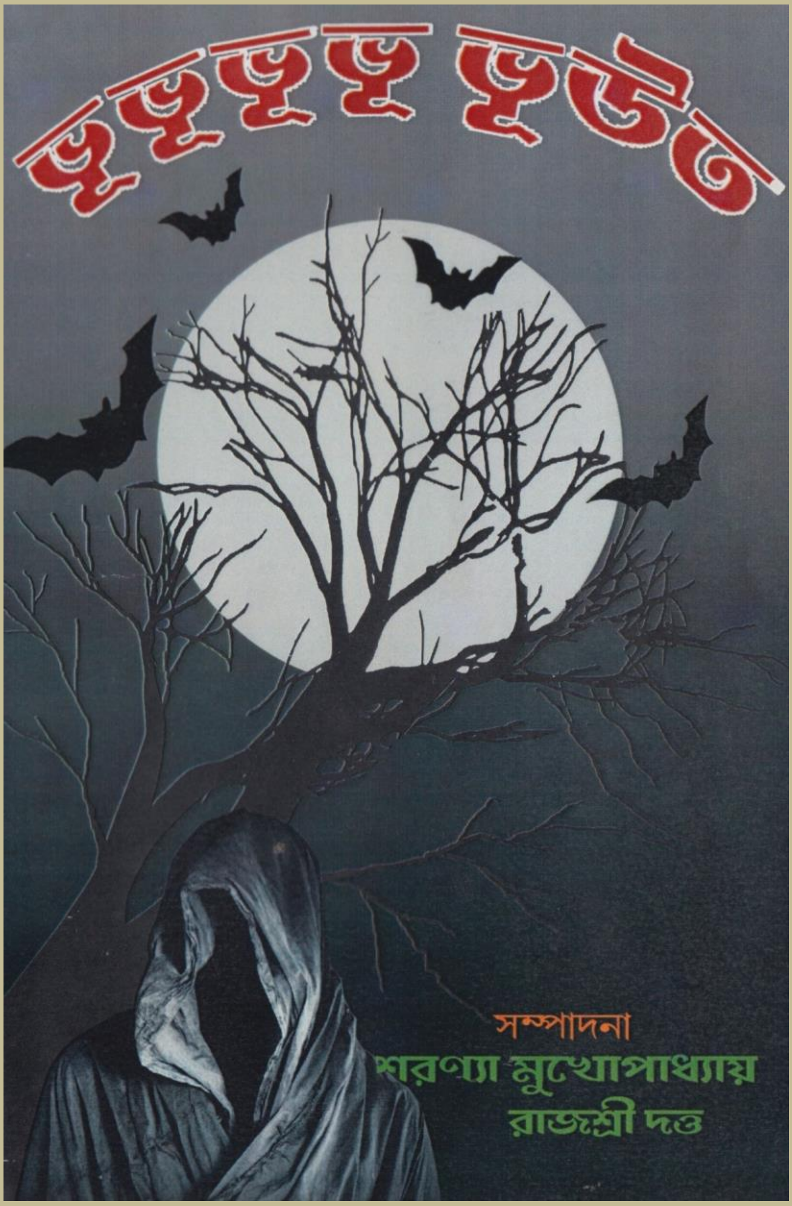
বৃহত্তর ভারতের নারীদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও সাফল্যের কথা মনে রেখে, 'গুঞ্জন' নভেম্বর ২০১৯ সংখ্যাটি বিশেষ 'নারী সংখ্যা' হিসাবে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। সম্প্রতি 'পাণ্ডুলিপি'র পাতায় পরবর্তী পাঁচটি সংখ্যার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। আশা করি এতে করে সকল লেখক বা লেখিকা যথেষ্ট সময় পাবেন ভাল লেখা পাঠানোর জন্য।

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলিতে আমাদের প্রকাশিত ছোটোদের বইয়ের কথা জানান হয়েছিল। এখন সেই 'ভূ ভূ ভূ ভূ ভূউত' বইটি অ্যামাজনে পাওয়া যাচ্ছে (লিঙ্কঃ তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)। আমরা আরও বেশ কতগুলো প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি, যথাসময়ে সে ব্যাপারে পাণ্ডুলিপিতে জানান হবে। আমাদের চলার পথে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। ■

বিনীতা

রাজশ্রী দত্ত – সম্পাদিকা, গুঞ্জন

পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ



মুল্যঃ ৮০ টাকা [৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে ৬০ টাকায় পাওয়া যাবে]

লিঙ্ক (Just copy and paste to your browser):

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

কলম হাতে

কলম হাতে

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

(৫)

এলাম কুকরা মঠে। এখানে শিব ঋনমুক্তেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। দুপুর দু'টো বেজে গেছে তাই মন্দিরের দরজা বন্ধ। একটি মেয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে বসেছিল, সেই মন্দিরের দরজা খুলে আমাদের শিব দর্শন এবং পুজোর ব্যবস্থা করে দিল। আর সাথে কয়েকটি ছোট পাথরের টুকরো আমার হাতে দিল। কুকুর কামড়ালে ওই পাথর জলে ঘষে ক্ষততে লাগিয়ে দিলে নাকি জলাতঙ্কের সম্ভাবনা থাকে না। পরীক্ষা করার সুযোগ নেই। একটি কুকুরকে নিয়ে বহুল প্রচারিত গল্পটিও মেয়েটি আমাদের বলল।

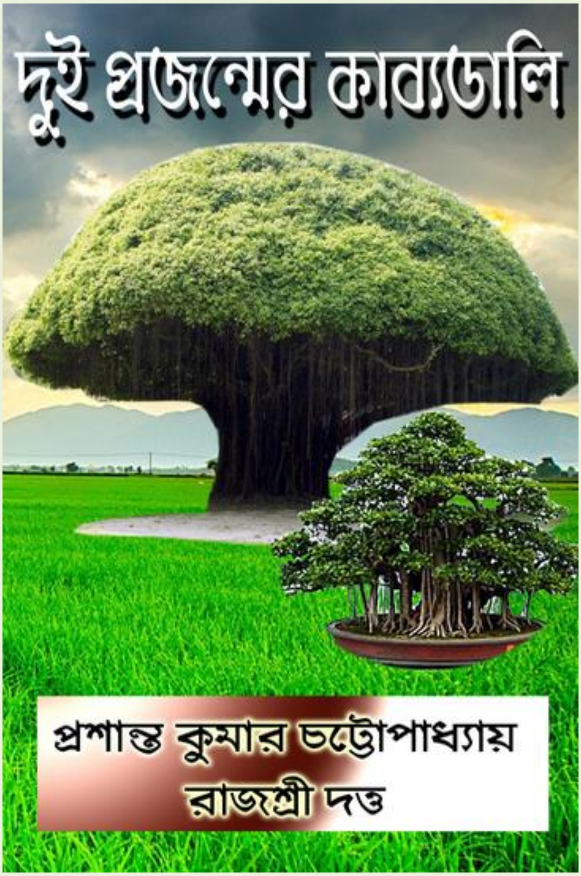
গল্পটি হলো, এই গ্রামের একটি বড়ো লোকের কাছে একদল বেদের সর্দার তার প্রিয় কুকুরটির বিনিময়ে কিছু টাকা ধার করে। কথা হয়, টাকা ফেরত দিয়ে তার প্রিয় কুকুরটিকে সে নিয়ে যাবে। কিন্তু টাকা ফেরত দিতে দেরি হচ্ছে। কুকুরটিও তার প্রভুর বিরহে খুব কান্নাকাটি করতে থাকে। ধনী লোকটির কুকুরটির ওপর খুব দয়া হয় এবং তাকে মুক্ত করে দেয়। মুক্তি পেয়ে সে তার প্রভুর কাছে ফিরে এলে বেদেদের সর্দার ভাবে কুকুরটি সুযোগ বুঝে

পালিয়ে এসেছে। এই আচরণটি সর্দার বিশ্বাস ঘাতকতা বলেই মনে করে এবং একটি ছুরি দিয়ে কুকুরটিকে হত্যা করে। তারপর সে ধনী ব্যক্তিটির কাছে কুকুরটির বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য ক্ষমা চাইতে যায়। ধনী ব্যক্তিটি যখন তাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলে এবং কুকুরটির প্রভু ভক্তির জন্য তাকে ঋণ থেকে মুক্তি দেয়। বৃতান্তটি শোনার পর বেদে সর্দার তার প্রিয় প্রভু ভক্ত পোষ্যটির শোকে পাগল হয়ে যায়। এই ঘটনাটিকে স্মরণে রেখে ধনী লোকটি ঋনমুক্তেশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠা করেন এবং গ্রামটির নাম হয় কুকরামঠ। সেই সঙ্গে মন্দিরের আশে পাশে সমস্ত ছোট বড় পাথর জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক বলে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায়। এর সাথে মেয়েটি আরও এমন কিছু কথা বলল – যা কখনই একজন সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে বলতে পারে না।

কুকরা মঠ থেকে প্রায় তিনটের সময় আবার হাঁটা শুরু করলাম। কিন্তু মন্দিরের বাইরে মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না। তিন কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এলাম কুণ্ডা গ্রামে। বড় গ্রাম, স্কুল, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক সবই আছে। বাস স্ট্যান্ড-এর পাশে একটি চায়ের দোকানে বসলাম। এই তিন কিলোমিটার পথ আমাদের আসতে লাগল এক ঘণ্টা। চা খেয়ে বেরিয়েই রাস্তায় দেখি ওই বাঙালি পরিক্রমাকারীদের সঙ্গী নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ওই দল ছেড়ে দিয়েছে, তাই ও এখন আমাদের সঙ্গী।

নমামি দেবী নর্মদে

আরও পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে আমরা সন্ধে ছ'টার সময় মহাবিরটোলা গ্রামে এক হনুমান মন্দিরে আশ্রয় পেলাম। আশ্রমের মাতাজী আমাদের পুত্র স্নেহে গ্রহন করলেন, আমার পায়ের করুন অবস্থা দেখে তিনি নিজের ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন, যার অর্ধেকই আমি বুঝতে পারিনি। রাত্রে খুব যত্ন করে খাওয়ালেন এবং কয়েকটা দিন থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। সামনেই দেওয়ালি, মন্দিরে বড় অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু আমাদের তো থাকা সম্ভব নয়। তাই শুরু হোক পথচলা। সঙ্গে নিয়ে চললাম মাতাজির অফুরন্ত স্নেহ এবং ভালোবাসা – ঠিক যেন মায়ের উষ্ণ স্পর্শ। ...ক্রমশ ■



দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

দুঃস্বপ্নের রাতে আমরা কজন

স্বাগতা পাঠক

(৩)

যথারীতি টাকিতেও মুষল ধারায় বৃষ্টি, কোনো রকমে মাথা বাঁচিয়ে আমরা নেমে গিয়ে দাঁড়ালাম একটা শেডের নীচে। বৃষ্টির প্রচণ্ড শব্দ, তার সাথে শেডের উপর বৃষ্টি পড়ার এক অন্য রকম শব্দ, আবার বনবনিয়ে ঝোড়ো হাওয়া... আমার মনটা কেমন যেন হারিয়ে যেতে চাইল। কি সুন্দর এই প্রকৃতি, কোনোদিন এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। মিনিট ১০ কেটে গেল ওই শেডের নীচে, রাই বার বার কাকে ফোন করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। এই জল কাদায় এই হদ্দ গ্রামে ফোনের নেটওয়ার্ক যে কাজ ঠিকঠাক করবে না সেটা জানা কথা। যখন আমরা ট্রেন থেকে নামি, ঘড়ির কাঁটা তখন বেলা ১২ টার ঘর ছুঁইছুঁই।

একটু একটু খিদেও পেয়েছে, কিন্তু এই স্টেশন চত্বরে এই মুহূর্তে হাতের নাগালে চা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না, তাই সেটা দিয়েই মনকে সান্তনা দিতে হল। প্রায় মিনিট বাইশ পর বৃষ্টিটা একটু কম হল, রাই আমাদের তাড়া দিয়ে বলল – নে এই সময় বেড়িয়ে পড়ি, না হলে আবার বৃষ্টি নামবে।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। স্টেশন চত্বর থেকে বেরোতেই সামনে দেখলাম সারি সারি ভ্যানের লাইন, তবে চালকরা বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচাতে বিভিন্ন দোকানের শেডের নীচে আশ্রয় নিয়েছে, আমাদের পাঁচজনকে এক সাথে দেখে একজন ভ্যানচালক বেরিয়ে এল। রাই ওদের পাড়ার ঠিকানা বলল, আর ওর কাকুর নাম বলল। সে ভ্যানওয়ালার হাবেভাবে বোঝা গেল – সে চেনে, তবে এই জল-কাদাতে তাকে ২০ টাকা বেশি দিতে হবে। রাই তাতেই রাজি হয়ে গেল। আমরা পাঁচজনে গায়ে রেনকোট চাপিয়ে ভ্যানে চেপে বসলাম। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা গন্তব্য স্থলে পৌঁছলাম।

একটা দোতলা বাড়ির গেটের কাছে এসে ভ্যান থামল, ততক্ষণে বৃষ্টিটা আরও বেগ নিয়েছে, আমরা ভ্যান থেকে নামলাম। প্রমথেশ গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে আসছিল, রাই গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকল, আর আমরা ওর পেছন পেছন। আমাদের রাস্তার ওপর দেখেই একজন মাঝ বয়সি ভদ্রলোক ছাতা নিয়ে সহাস্য বদনে এগিয়ে আসছিলেন, আমি বুঝলাম ইনিই রাইএর কাকা। ভদ্রলোক আমাদের আপ্যায়ন করে ঘরে ঢোকালেন। বেশ বড় বাড়ি, সারা বাড়িতে অনেক গাছ পালা আছে। দোতলা ঘরের একপাশে বিচ্ছিন্ন একটা টিনের চালার ঘর, সেখান থেকেই একজন ভদ্রমহিলা বেড়িয়ে এলেন, রাই পরিচয় করিয়ে দিল ইনি ওর কাকিমা।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

এখনও আরও অনেকের সাথে আলাপ করা বাকি, কিন্তু আগে আমাদের একটু ফ্রেস হতে হবে। অর্ণব আর প্রমথেশকে দেওয়া হল দোতলার দক্ষিণ দিকের একদম কোনের ঘরটা, আর আমাদের তিনজনের জন্য বরাদ্দ হল মাঝের ঘরটা। দু'ট ঘরই বেশ বড়। কাকিমা আমাদের বললেন ফ্রেস হয়ে একেবারে খাবার খেতে আসতে। কারণ, আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখনি প্রায় বেলা একটা বাজে, স্নান সেরে উঠতে উঠতে প্রায় দেড়টা দুটো বেজে যাবে।

এইখানে টাইম কল বা পাম্পের জলের ব্যবস্থা নেই, বাড়ির পেছনের দিকে বিরাট একটা স্নান ঘর আছে তার মাঝে আছে একটা বিরাট চৌবাচ্চা। আর তা ছাড়া বাড়ীতে আছে চাপা কল আর পাতকুয়া। সত্যি রাইদের বাড়িতে এসে একদম বিশুদ্ধ গ্রাম বাংলার ছোঁয়া পেলাম।

ফ্রেশ হয়ে আমরা সকলে এসে পৌঁছলাম একটা বড় ঘরে, সেখানে ছোটো ছোটো আসন পেতে দেওয়া হয়েছে, এইখানে চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়ার রেয়াজ নেই। আমাদেরও বেশ মজা লাগল, নতুন কিছু ট্রাই করব। আমরা পাঁচজন আর রাইএর কাকা প্রদীপ বাবু খেতে বসলাম। রাইএর ঠাকুমা দাদু একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েন, আসলে দু'জনেই অসুস্থ। ওনাদের সাথে বিকেলের আগে আলাপ হওয়ার চান্স নেই। আর রাই এর কাকার দু'ট ছেলে মেয়েও আছে, ওরা স্কুলে গেছে ফিরতে ফিরতে চারটে বাজবে।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

এত জল কাদা পেরিয়ে এসে দুপুরের লাঞ্চ দেখে মন যেন ভরে গেল, উফফ্... ভাত, ডাল, চিংড়ি মাছের মালাই কারি, আর সরষে ইলিশ, শেষ পাতে চাটনি আর ঘরে পাতা দই। রাই খেতে খেতে ওর কাকিকে বলল – হ্যাঁ গো তুমি ওই ঘরে রান্না করছিলে কেন?

রাইয়ের কাকি প্রমথেশ এর পাতে দুই পিস ইলিশ তুলে দিয়ে বলল – আর বলিস না রাই, গ্যাসটা শেষ হয়ে গেছে। বুকিং করেছি, তবে এই বৃষ্টির জন্য গ্যাস দিয়ে যেতে পারছে না। ওই ঘরে কিছু কাঠ মজুত ছিল, তাই এই দুই দিন ওখানেই কাঠে রান্না করছি।

অর্ণব বলল – সত্যি স্মোকি ফ্লেভারে এই সরষে ইলিশটা যা রেঁধেছেন কাকিমা তার তুলনা হয়না। রাইয়ের কাকিমা একটু হাসলেন।

ইচ্ছে ছিল খাবার দাবার শেষ করে পাঁচজনে মিলে একটু আড্ডা দেবো, কিন্তু এমন সুন্দর লাঞ্চএর পর, এই বর্ষার দুপুরে একটা আরামের ঘুম আমরা কেউ মিস করতে চাইনা। তাই আমরা যে যার ঘরে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমের দেশে পাড়ি দিলাম।

যখন আমার ঘুম ভাঙলো, সন্ধ্যে নেমে গেছে, এইখানে মশার উপদ্রপ আছে বেশ, তাই মশারী টাঙ্গিয়ে নিয়েই আমরা ঘুমিয়েছিলাম। মশারির ভেতর থেকেই চোখ পড়ল, ঘরের দক্ষিণ কোনের টেবিলে একটা হ্যারিকেন জ্বালানো,

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

বুঝলাম সন্ধ্যে নামতেই লোড শেডিং হয়েছে। আমার পাশে অনুরাধা নাক ডেকে ঘুম দিচ্ছে, আর রাই মনে হয় উঠে গেছে, নীচের ঘর থেকে শাঁখের আওয়াজ আসছে, বুঝলাম কাকিমনি সন্ধ্যে পুজো দিচ্ছেন। একটা সুন্দর আমেজ ভরা ভাত-ঘুমের পর আমার শরীরটা একদম ঝরঝরে লাগছে। সব ক্লান্তি যেন কোথায় পালিয়ে গেছে, চোখ ডলতে ডলতে আমি নীচে নেমে এলাম। দেখলাম বসার ঘরে দু'ট ছোট বাচ্চা রাইকে জাপটে ধরে বসে – আর ওদের সামনেই ওদের দাদু ঠাম্মা গল্পে মত্ত। ঐ ঘরেও একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। আমি এগিয়ে যেতে রাই আমাকে ডেকে বলল – ভেতরে আয়। তারপর ওর দাদু ঠাম্মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সত্যি অমায়িক মানুষ ওনারা, স্বস্নেহে ঠাম্মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এর মধ্যে কাকিমা, সকলের জন্য চা মুড়ি আর তেলে ভাজার সম্ভার নিয়ে হাজির। আমি বললাম – কাকিমা তুমি সব একা একা করছো কেন? একবার আমাকে ডাকতে পারতে, একটু না হয় হাতে হাতে হেল্প করতাম।

কাকিমা আমার গালটা আস্তে করে চেপে দিয়ে বললেন – কচি মেয়ে তুমি কি হেল্প করবে? আর তা ছাড়া তোমরা আমাদের বাড়ির অতিথি। অতিথিকে দিয়ে কেউ কাজ করায় না। কাকিমা এবার রাইএর উদ্দেশ্যে বলল – যা ওদেরকেও ডেকে আন।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

আড্ডা গল্প চায়ে আমাদের সন্ধ্যেটা বেশ সুন্দর ভাবেই কেটে গেল। এবার কাকিমা রাতের রান্না চাপাবেন। আমি কোনো দিন নিজের চোখে কাঠের জ্বালে রান্না দেখিনি, তাই বায়না ধরলাম আমি কাকিমার সাথে রান্না ঘরে যাব, রান্না দেখব, তবে কাকিমা শর্ত দিল, চুপটি করে বসে দেখতে হবে কোনো কাজ করতে চাইবে না। আমিও হেসে রাজি হলাম। রাতের মেনু হল – ভাত, ডাল, আলুর চোখা, আর চুনো মাছের ঝাল।

উফফ্... সে যে স্বর্গ, রাত বাড়ার সাথে সাথে বৃষ্টির বেগটাও বেড়ে গেলো। খাওয়া দাওয়া সেরে, আমরা ওপরে গেলাম। দুপুরে আড্ডা হয়নি, তাই অর্ণব বলল – অন্তত আমাদের ৩০ মিনিট একটু আড্ডা দেওয়া দরকার। দোতলার কোনের ঘরেই আমরা বসলাম, আমি রাইকে বললাম – হ্যাঁরে রাই, সব তো হল, কিন্তু যেটার জন্য আসা সেটা কি হবেনা? রাই বলল – হ্যাঁ হবে কাল রাতে।

অনুরাধা বলল – সেকি আমরা তো কাল সকালেই চলে যাব, তা কাল রাত বলছিস যে বড়! রাই একটু মুচকি হাসি দিয়ে বলল – হ্যাঁ, আমার কাকু কাল যেতে দেবে বলে তোর মনে হয়? অন্তত দু'তিন দিন থাকতে হবে। প্রমথেশ বলল – বলিস কি রাই, আমাদের কথা ছিল এক রাতের! এর মধ্যে অর্ণব বলল – আরে, ওই একরাত বললেই কি হয় নাকি? আসলে কোথাও অমন তাড়াহুড়ো চলেনা। আমি বললাম –

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

অর্ণব আর নড়ছেনা দু' দিনের আগে। রাই বলল – শোন, আমরা পরশু সকালে বেড়িয়ে পড়ব, কোন অসুবিধে হবে না – শুধু তো কালকের দিনটা।

আসলে বৃষ্টি বাদ দিলে, রাইদের বাড়িতে আমাদের সকলেরই খুব ভাল লাগছে, কাকু কাকিমার আপ্যায়ন, ঠাম্মা দাদুর ভালোবাসা, পুঁচকে দুটোর আবদার – আর সন্ধ্যে বেলার জমিয়ে আড্ডা, কাকিমার হাতের স্বর্গীয় রান্না। একটা মায়ার বাঁধন, যেটা ছেড়ে বেড়োতে আমরা চাই না। তাই সকলেই রাজি হয়ে গেলাম রাই এর প্রস্তাবে।

প্রায় সকাল ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি, এর মধ্যে, বৃষ্টিতে ভিজে কাক হয়ে অর্ণব, প্রমথেশ আর প্রদীপ কাকু আসছেন। সকাল বেলা উঠে ওরা মাছ ধরতে গিয়েছিল ইচ্ছামতি নদীতে, একটা দু'ট নয়, ওরা বেশ মাঝারি সাইজের ছয়টা পোনা মাছ ধরেছে। ওদের মুখের হাসি দেখে বুঝলাম বিশাল আনন্দ পেয়েছে। আসলে আমরা কাঠ-ইঁটের জঙ্গলে থাকা শহরের প্রাণী, এমন সবুজ গ্রামের ছোঁয়া পেলে সেটা পুরোটাই গিলে নিতে চাই। এই দিকে সকাল থেকে রাইএর পাত্তা নেই, সে নাকি কোথায় গেছে। সকাল সকাল স্নান সেরে আমরা জল খাবারে মন দিলাম। লুচির সাথে মাখা মাখা আলুর তরকারি এবং টাকির বিখ্যাত ছানার জিলিপি। উফফ্... এ যেন স্বর্গ সুখ!

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

কিছুক্ষণ বাদে রাই কোত্থেকে ফিরে এসে জানাল যে আজ রাতের প্ল্যান পাকা, সে ব্যবস্থা করে এসেছে। দুপুর বেলা ওর একজন বন্ধু আসবে, সেই বাড়িতে সব কথা বলে ম্যানেজ করবে। আমরা বেশ উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম রাইয়ের সেই বন্ধুর জন্য।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে দোতলার ঘরে বসে আমরা পাঁচজনে আড্ডা দিচ্ছি, রাইএর পুঁচকে ভাই বোন দুটোও আছে – সেগুলো গল্প শুনতে শুনতে আমার আর অনুর কোলে ঘুমিয়ে কাদা। এর মধ্যে কাকিমনির গলা পাওয়া গেল, রাই অপূর্ব এসেছে, বুঝলাম রাইয়ের বন্ধু। রাই বলল – ওকে ওপরে আসতে বল।

তারপর দেখলাম, একজন রোগা পাতলা গোছের চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে ঘরে ঢুকল। রাই আমাদের সাথে ওর আলাপ করিয়ে দিল। এই গ্রামেই বাড়ি ওর, রাইয়ের স্কুলের বন্ধু, কিন্তু আমার মনে হল – একটু ঢপ দিচ্ছে রাই। ওর থেকে বয়েসে বড় ওর স্কুলের বন্ধু কি করে হয়! কলেজ শেষ করেছে, বাবার অবর্তমানে নিজেই বাবার ব্যাবসা দেখা শোনা করে রাইয়ের বন্ধু, অপূর্ব দত্ত।

আমাদের সাথে কথাবার্তা শুরু করেছে অপূর্ব, এমন সময় কাকিমনি এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে হাজির। অপূর্বর হাতে দিয়ে বলল – এই নাও খাও। অপূর্ব মানা করতে থাকল, কিন্তু কাকিমনী বলল – আমাদের বাড়ির জামাই, মানে হবু

জামাই খালি মুখে থাকবে সেটা হয় না, বলে হাসতে হাসতে নীচে চলে গেল। আমরা সবাই অবাক, মানে এটা রাইএর বন্ধু নয়, হবু বর! আমরা এত দিনের বন্ধু, সে একবারও বলেনি যে সে প্রেম করে এবং আস্ত একটা বয়ফ্রেন্ড এই গ্রামে লুকিয়ে রেখেছে। সবাই মিলে রাইকে চেপে ধরলাম। তারপর জানলাম, সেই স্কুল থেকেই ওদের প্রেম – অপূর্ব ওর থেকে সিনিয়র ছিল। তারপর মাধ্যমিকের পর ওরা আলদা হয়ে যায়, কিন্তু প্রতিমাসে ওরা ঠিক দেখা করত, হয় রাই এইখানে আসত – না হলে অপূর্ব যেত যাদবপুরে। বেশ মিষ্টি একটা প্রেম...

রাই আর অপূর্ব আগের থেকে সব প্ল্যান করে রেখেছিল, আজ আমাদের সকলের রাতে খাবার নিমন্ত্রণ থাকবে অপূর্বদের বাড়িতে, এবং একটু বেশি রাত করে আমরা সময় কাটিয়ে বৃষ্টির অজুহাতে রাতে ওদের বাড়িতেই থেকে যাব, ওই বাড়ি থেকেই আমাদের মিশন ঘোস্ট অ্যাডভেঞ্চারটা আজ রাতে সম্পূর্ণ হবে। অপূর্বর বাড়িতেও, ওর মা ছাড়া আর কেউ থাকে না। আর আজ রাতে ওর মা যাবেন ওর পিসিমনির বাড়ি। তাই আমাদের বেরোতে তেমন বেগ পেতে হবে না।

সন্ধ্যের চা আর জলখাবার খেয়ে আমরা সাতটা নাগাদ গায়ে রেন কোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অর্ণব কায়দা করে লুকিয়ে ওর ক্যামেরাটা আমার হাতে পাচার করেছে। দেখতে

পেলে কাকু বা কাকিমনি সন্দেহ করবে। পায়ে হেঁটে বারো মিনিটের মধ্যেই আমরা পৌঁছলাম অপূর্বদের বাড়িতে। সে এক বিরাট তিনতলা বাড়ি, বিশাল উঠোনটা ঘেরা উঁচু প্রাচীর দিয়ে। অন্ধকারে খুব ভালভাবে বোঝা না গেলেও বাড়ির ভেতরের আলো আঁধারিতে এইটুকু বোঝা গেল যে একটা বনেদিয়ানার ছাপ আছে ওদের বাড়িতে।

সদর দরজা দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম বসার ঘরে, বেশ বড় ঘর। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন অপূর্বর মা, বেশ সুন্দর পাট করে শাড়ী পরা, সারা শরীরে ভারী ভারী গয়না, না না সোনার নয়, তবে বেশ দামী সিটি গোল্ডএর হবে। বয়স বোঝা যায় না। গ্রাম্য মহিলা হয়ে এত সুন্দর ভাবে নিজেকে মেনটেন করেন – ভাবা যায় না। কই রাইএর কাকিমাকেও তো দেখলাম, এত ঠাট বাট তার নেই।

যাই হোক, আমাদের সাথে আলাপের পর্বটা শেষ হল। কথা মতো উনি বেড়িয়ে যাচ্ছেন, ড্রাইভার এসে পড়েছে। সামনের বারান্দার কাছে গাড়ির আওয়াজ পেলাম – মানে বাড়ির ভেতরেই গাড়ির গ্যারেজ, অন্ধকারে খেয়াল করিনি। উনি আমাদের থাকতে বলে বেরিয়ে গেলেন, আর অপূর্বকে বলে গেলেন আমাদের আতিথেয়তায় যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

বেশ কিছুক্ষণ আমাদের গল্প আড্ডায় কেটে গেল। কথায় কথায় জানলাম অপূর্বর মা, নীলা দেবী কলকাতার মেয়ে।

ওরে বাবারে (ধারাবাহিক)

অপুর্বর বাবার সাথে প্রেম করে বিয়ে, তাই উনি গ্রামে থাকলেও শহরের আদব কায়দা ভুলে যাননি। কথামতো রাত দশটার মধ্যেই আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল।

এবার অপূর্ব কাকে যেন ফোন করে বলে দিল যে আমরা মিনিট পনেরোর মধ্যেই আসছি। বুকের মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। মুখে অনেকবার অনেক বুলি ঝেড়েছি, তবে সত্যিকারের যাওয়া এই প্রথম। ভূত নামক জিনিসটাতে যদিও বিশ্বাস নেই, তবুও ভয় আছে ষোলো আনা, তবে সেটা কারুর কাছে প্রকাশ করিনি কোনো দিন। ...ক্রমশ ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com) এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’ট ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি’ ‘গ্রুপে’ত অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।



বি.দ্র.: ডিসেম্বর সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯।

ভ্রমণ কাহিনী

ডেসার্ট ট্রায়াঙ্গল

(বিকানীর পর্ব)

মালা মুখার্জী

ভোরের আলো ফোটার আগেই এসে গিয়েছিলাম বাসস্ট্যাণ্ডে । শেষবারের মতো প্রথম সূর্যালোকে দর্শন করলাম ফেলুদার স্মৃতিবিজড়িত সোনার কেল্লাকে। বাস ছুটল বিকানীরের দিকে। মরুভূমি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে কাঁটাঝোপের আর বাবলা গাছের বন এল, যেখানে গরু-ছাগলের বদলে চরছে উট। কেউ কেউ পরমানন্দে কাঁটাঝোপ খাচ্ছে।

বাস ফালোডি হয়ে বিকানীরে পৌঁছাল বেলা তিনটে নাগাদ। অটো করে পনের মিনিটেই পৌঁছালাম ধোলামরু হোটেলে। এ হোটেলটিরও নামের পিছনে আছে এক লোকগাথা। রাজস্থানী লোকগাথা অনুযায়ী রাজকুমার ধোলা আর রাজকুমারী মরুর বিবাহ ছোটোবেলায় হলেও ধোলা বড় হলে এ বিয়ে ভুলে যায় ও মালওয়ানি বলে আর এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে। ওদিকে রীতি অনুযায়ী মরুর *'গনা'* বা শ্বশুরালযাত্রার সময় এলে মরুর পিতৃগৃহ হতে রাজা ধোলার নিকট পত্র আসে, যা মালওয়ানি নষ্ট করে দেয়। এরপর

একদল কিন্নর ধোলার রাজদরবারে গানের মাধ্যমে তাঁর প্রথম স্ত্রীর কথা মনে পড়ায়। ধোলা মরুকে সম্মানে আনতে গেলে মালওয়ানি ষড়যন্ত্র করে এক বেদেনীকে মরুর তাঁবুর ভিতরে সাপ ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন। সর্পদংশনে মরুর মৃত্যু হয়। মরুর মৃত্যুতে ব্যাথিত প্রেমিক ধোলাও চিতায় ঝাঁপ দেয়। এই বিয়োগান্তক প্রেমকাহিনীকে স্মরণে রেখেই ধোলমরু নমকরণ হয়েছে এই আর. টি. ডি. সি.র হোটেলটির।

আমাদের যেতেই একটি ঘর দেওয়া হল একতলায়, আমিও কালবিলম্ব না করে ভেজ-পকোড়া আর চায়ের অর্ডার দিলাম। আর. টি. ডি. সি.র ভেজ পকোড়া খুবই নাম করা। এই সঙ্গেই ঠিক করে নিলাম কালকের সিটি ট্যুরের গাড়ী। বিকানীরে কার্ণিমাতা মন্দির, জুনাগড় দুর্গ, প্যালেস, ছত্রী আর মিউজিয়ম ছাড়াও ক্যামেল রিসার্চ ইন্সিটিটিউড আছে, যা অবশ্যই যাওয়া উচিত। ড্রাইভারসাব বললেন মন্দির দিয়েই শুরু করতে।

সকাল সকাল কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম। এখানে বলা ভালো আরটিডিসির দুরকম হোটেল আছে, কমফোর্ট বা বাজেট হোটেল, যার ঘর ১২০০-১৫০০ এর মধ্যে আর ক্লাসিক, যার ভাড়া দুই থেকে আড়াই।

ধোলামরু কমফোর্ট হোটেল, তাই মৃমালের মত নানারকম বুফে ব্রেকফাস্ট নেই, যা চাইবে তা বানিয়ে দেবে। তাড়াতাড়ির মধ্যে আলু পরোটা বানিয়ে দিল, সঙ্গে সাদা দই। খেয়েদেয়ে মন্দিরের উদ্দেশ্যে বেরলাম।

ভ্রমণ কাহিনী

কয়েক বছর আগে ন্যাশানাল জিওগ্রাফির দৌলতে কার্ণিমাতার মন্দিরের কথা বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে। এই মন্দির বিখ্যাত এর ইঁদুরের সংখ্যার জন্য, যারা নির্ভয়ে সাদা মার্বেলের মেঝেতে ঘুরছে আর রৌপ্যপাত্রে দুধ খাচ্ছে। এক একজন তো খরগোসের সাইজের। চানা খাওয়ালে কুটকুট করে খায়, তবে কাউকে কামড়ায় না। পাঠকগণ নিশ্চয় ভোলেননি যোধপুররাজ কার্ণিমাতার কৃপাতেই তৈরি করেছিলেন মেহেরণগড় দুর্গ। এই কার্ণিমাতার সন্তানেরা যমরাজের বরে ইঁদুররূপে অমর হয়ে আছেন।

কার্ণিমাতা দর্শন করে জুনাগড় ফোর্টে চললাম। জুনাগড় বা ওল্ড ফোর্টকে চিন্তামণিও বলা হয়। যদিও রাজপরিবার লালগড় প্রাসাদে থাকেন, তথাপি এই দুর্গটি ভীষন রকম ওয়েল মেন্টেণ্ড আর দেখার মতো। মাণ্ডোর বা যোধপুরের রাজারা ও যোধার দ্বিতীয় পুত্র রাও বিকা ১৪৭৮ সালে মরুভূমির জংলাদেশে এই বিকানীর রাজ্যের পত্তন করেন, আগেই বলেছিলাম যে যোধপুর আর বিকানীর জ্ঞাতিরাজ্য। বিকানীরের ষষ্ঠ রাজা রাইসিংজি মুঘল আধিপত্য মেনে নেন। মেবার জয়ে আকবরকে সাহায্য করে জায়গীর পান। এসময়ে জুনাগড় দুর্গের প্রভূত উন্নতি হয়। ষোড়শ শতকে রাজা করণ সিংহ করণমহল প্রাসাদ বনান, যা রাজপুত স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য সৃষ্টি।

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম রাণীমহল, বাদলমহল ইত্যাদি। বর্ষার জল কেমন করে পড়ে তা মরুদেশের রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর পিতা এই অনবদ্য বাদল মহল নির্মান করেন। সাদা-নীল পাথরের দেওয়ালে মনে হবে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সত্যি, আগেকার শিল্পীরা কি অপূর্ব নির্মানশৈলীর অধিকারই না ছিলেন! রাজকন্যা মেঘবৃষ্টির তত্ত্ব কতটা বুঝেছিলেন জানি না, তবে আমি সেই স্থপতিকে নমন করলাম যিনি সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছিলেন এই মহল বানাতে। অনুপমহল, ঝরোখা এসব দেখার পর দৌলত পোলে এলাম। যোধপুর ফোর্টের মতো এখানেও জহরব্রতী সতীদের হাতের ছাপ।

ফোর্টের মিউজিয়মে আর পাঁচটা কেল্লার মতোই রাজাদের অস্ত্র, পোশাক, গয়না রাখা, আর একদিকে পেন্টিং। এর মধ্যে একটি বিশেষ ছবির সামনে বেশ ভীড়। কৌতুহলবশত আমরা এগিয়ে গেলাম। অন্যান্য ছবির মতো এটি দেবদেবী, যুদ্ধ, বিয়ে বা শিকারের ছবি নয়, বরং এক রাজকন্যার ছবি যিনি ছুরি নিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে একটি রাজপুরুষের ওপর চড়াও হয়েছেন। ছবিটি কার বোঝার জন্য অন্য একটি দলের গাইডের কথা শুনলাম। ছবিটি বিকানীরের রাজবধূ কিরণ বাঈয়ের, যিনি মেবারের রাজকন্যা আর রাণাপ্রতাপের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। জনৈক মোগলসম্রাট মীনাবাজারে তাঁর অঙ্গস্পর্শ করলে তিনি ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাদশা ক্ষমা

চেয়ে জীবন ভিক্ষা পান। এই সাহসী নারীকে কুর্ণিশ জানিয়েই কোনো তৎকালিন শিল্পী এই চিত্রটি এঁকেছেন।



চিত্র পরিচয়ঃ রাজবধূ কিরণের ঘুরে দাঁড়ানোর ছবি (বিকানিরের জুনাগড় দুর্গ)...

রাজাদের রিয়াসত দেখা শেষ হলে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করলাম, এখানে ঘেবর মিঠাই খুব জনপ্রিয়, পিওর দেশী ঘিয়ের তৈরি। বিশেষ দোকানের ঘেবরের অর্ডার ছিল, বিকানির যাব শুনে বন্ধু ও প্রতিবেশীগণ বলে দিয়েছিলেন নিয়ে আসতে। দু-তিন কিলো ঘেবর কেনা হল। তারপর খাওয়াদাওয়া। ননভেজের মধ্যে লালমাস (পাঁঠা বা ভেড়া) এখানেও পাওয়া যায়।

আমাদের এবারের গন্তব্য হলো ক্যামেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউড। এতক্ষণ ধরে অনেক উট দেখেছি, কিন্তু উটের বায়োলজি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা হয়নি। উটের বায়োলজির কথা বললেই জটায়ুর মতোই মনে পড়ে ওরা জল কোথায় স্টোর করে? কুঁজে না পাকস্থলিতে? যাই হোক, উটকে বৈজ্ঞানিকভাবে জানতে হলে এখানে আসতেই হবে।

ভারতে চার রকমের উট পাওয়া যায় চার জায়গায়, কাথিওয়াড়, মারওয়াড়, কচ্ছ আর লাদাখে। লাদাখের উটের দু’টো কুঁজ। সত্যিই তো, মরুভূমি বললে আমরা উষ্ণ মরুভূমি বা রেগিস্তানকেই বুঝি, শীতল মরুভূমিকে ততটা নয়। উটের সম্পর্কে নানা কথা জানতে জানতে জানলাম যে উট নাকি কামড়েও দেয়, বিশেষত মাথায় আর তা মানুষের মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

ছোট্ট এক টুকরো জায়গায় কৃত্রিম মরুভূমিতে ক্যামেল সাফারি করে, উটের দুধের চা আর কুলফি খেয়ে যখন বেরলাম তখন পাঁচটা। ক্যামেল রিসার্চ ইনস্টিটিউড বন্ধ হলো বলে। বিকানীরে এসে কিছু নেব না, তা হয় নাকি? আমি অবশ্য জন্তুর চামড়া বা হাড় ব্যবহারের পক্ষপাতি নই, তাই উটের চামড়া বা হাড়ের কিছু নিইনি। তবে উটের লোমের লেপ নিতে ভুলিনি। সবচেয়ে ভাল লাগল যখন ওঁরা দিল্লিতে ক্যুরিয়র করে পাঠিয়ে দিলেন। আঃ, জানুয়ারির হাড় কাঁপানো শীতে মরু শহরের এক টুকরো উষ্ণতা নিয়ে হাজির হল বিকানীর ভ্রমণের স্মারক লেপ দুটি। সমাপ্ত ■

গুঞ্জনের আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু*

ডিসেম্বর ২০১৯ ☞ অণুগল্প সংখ্যা ■ মার্চ ২০২০ ☞ রহস্য সংখ্যা
জানুয়ারি ২০২০ ☞ আশা সংখ্যা ■ এপ্রিল ২০২০ ☞ নববর্ষ সংখ্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২০ ☞ চালচিত্র সংখ্যা

* বিশেষ কারণে সম্পাদক মণ্ডলী নির্ধারিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে পারেন।

ছায়া-কায়া

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৮)

সুধীরবাবু সকাল সকাল উঠে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন কুমোরটুলির পাড়ায়। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাত্রা, বেশ অনেকটা পথ। একবার মনে হোল জয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে গেলে ভালোই হত। কিন্তু দেরী হয়ে যাবে সেই চিন্তাও মাথায় ছিল, তাই সোজা গন্তব্যে পৌঁছানোই শ্রেয় ঠিক করলেন।

সামনেই পূজা বড়-ছোট নানান থিমের দুর্গা মূর্তিতে কুমোরটুলির গলি ঠাঁসা। তবে সময়ের সাথে সাথে প্রতিমার ধরন-গড়ন অনেক পাল্টে গিয়েছে। প্রতিমার মধ্যে সেই মমতাময়ী মৃন্ময়ী ভাব প্রায় ম্রিয়মান। বেশিরভাগ মূর্তিই যেন এক একটা রঙিন মডেল।

সুধীরবাবু পুজোর সময় প্রায় প্রতি বছরই বাইরে বেড়াতে যান। তাই মূর্তির এই রূপ বদলের ব্যাপারটা সম্পর্কে সেরকম সচেতন নন। কিছুটা অলি-গলি যাওয়ার পর দেখলেন, সেখানে এখনও সেই বনেদিয়ানা ধাঁচ স্বমহিমায় বর্তমান রয়েছে। আর এইসব জায়গাতেই যেন বেশ পুজো পুজো ঘ্রান পাওয়া যাচ্ছে। এই হরেক মূর্তি দেখতে দেখতে

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

অনেকগুলো সরু সরু আঁকাবাঁকা গলি পেরিয়ে, সুধীরবাবু অবশেষে ব্রজনাথ বাবুর বাড়ি পৌঁছলেন। বাড়িটি অযত্নে আর মেরামতের অভাবে প্রায় ভগ্নপ্রায়। শার্সি টানা জানালাগুলো কামটের মতো দাঁত বের করে ঝুলছে, আগামী তীব্র ঝড়ে অবসর নেওয়ার জন্য। ছাদের ওপর থেকে অশত্থের শাখাগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে কোন প্রেতাত্মার হাতছানি। মনে মনে সুধীরবাবু বললেন – "ভাগ্যিস সকালে এসেছি, রাতে এলে এই বাড়ি আমার পক্ষে খোঁজা সম্ভব হত না। তাছাড়া কবে কলেজে পড়ার সময় আসতাম! তখন বাড়ির এই রকম হাল ছিল না। স্যার খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন। কিন্তু আজ দেখো তাঁর বাড়িরই কি অবস্থা!"

খোলা দরজা দিয়ে সুধীরবাবু ভিতরে ঢুকলেন, নীচটা বেশ অন্ধকার, বাঁদিক দিয়ে পেঁচানো ইট বার করা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যেতেই দেখলেন সামনের দালানে দীনুবাবু বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। সুধীরবাবুকে দেখে সোল্লাসে বলে উঠলেন – "আরে সুধীরদা, এসো এসো। স্যার একটু ব্যস্ত আছেন। একটু পড়ে স্যার ডাকবেন। এখন এখানে বসো।"

দরজার ফাঁক থেকে নির্গত রাশি রাশি ধোঁয়া বাইরের পরিবেশকে ধোঁয়াটে করে দিচ্ছিল। তবে সে ধোঁয়ায় ছিল ধুনোর গন্ধ। বাইরেটা যেমন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর লাগছিল, ভেতরটা ঠিক তার উল্টো, একটা শান্তিময় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। স্যার যোগসাধনা আর তন্ত্র সাধনার সাথে যে যুক্ত আছেন তা

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

সুধীরবাবু কলেজ লাইফ থেকেই জানতেন। তাই অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। তবে কলেজে যখন আসতেন, মনে হতো স্যার একেবারে বিলেত ফেরত সাহেব। তিনি পোশাক-আশাকের ব্যাপারে বেশ বিলেতি সৌখিনতা পছন্দ করতেন।

কিছুক্ষণ পর সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত, গায়ে কমলা উত্তরীয় দেওয়া বেশ সুঠাম চেহারার এক ভদ্রলোক সামনের দরজা খুলে বেড়িয়ে এলেন। প্রথমটা দেখে সুধীরবাবু বুঝতেই পারেন নি, তাঁদের সেই স্যার ব্রজবাবু। দীনু না বললে হয়তো তিনি চিনতেই পারতেন না। কারণ বেশভূষার সাথে চেহারার অনেক বদল ঘটে গিয়েছিল ব্রজবাবুর। তবে সে বদলে বার্ধক্যের ছাপ নেই, বরং দিব্যজ্যোতিপূর্ণ এক দীপ্তমান সন্ন্যাসীর রূপ। ব্রজবাবু সুধীরবাবুর সামনের কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে তাঁর মুখোমুখি বসলেন।

তারপর তিনি বললেন – "অনেক বছর পর তোমার সাথে দেখা হল সুধীর। দীনুর সাথে আমার যোগাযোগটা বরাবরই আছে। ও মাঝে মধ্যেই এখানে আসে। তা তোমার খবর কি বলো? সব কুশল তো?"

– হ্যাঁ, মানে সব ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু আমার একমাত্র ভাগ্নিটার সংসারে হঠাৎ একটা ঝড় সব ওলটপালট করে দিয়েছে। আমার ভাগ্নি রঞ্জনার স্বামী, মানে জয়, একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর মানসিক ও শারীরিকভাবে দুর্বল ভীষণ হয়ে পড়েছে,

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

আর তার ফলে ওদের সম্পর্কেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। জয় কোনভাবেই আমার ভাগ্নি অর্থাৎ রঞ্জনাকে সহ্য করতে পারছেনা, অথচ এই রঞ্জনা ছিল তার শক্তি, সাহস, অনুপ্রেরনা, ভালবাসা...

এছাড়া ডাক্তার বলেছে জয় আর কখনও হাঁটতে পারবেনা, অথচ প্রতিদিন রাতে সকলের চোখের আড়ালে একা একা অন্ধকারে সে যে কোথায় চলে যায়, তা কেউ জানে না। যে চলতেই পারেনা সে কি করে রাতে হাঁটতে পারে? আবার সকালে তাকে নিজের ঘরেই দেখতে পাওয়া যায়। এটা কি করে সম্ভব হয়!

আমার তো মাথাই কাজ করছিল না – কি করব এই ভেবে। কাল আপনার কথা দীনু বলতেই, আমার মাথায় এলো এ সমস্যাটার যোগ্য সমাধানটা হয়তো আপনিই করতে পারবেন। কলেজে পড়ার সময় দেখেছি, কতজনের কত সমস্যা আপনি কত সহজ উপায়ে সমাধান করে দিতেন।

দীনুবাবু পাশ থেকে বলে উঠলেন – "আচ্ছা এমন নয় তো যে জয় সত্যি হাঁটতে পারে, যেটা তোমরা জান না?"

মনের খেলা (ধারাবাহিক)

ব্রজবাবু এক মনে কথাগুলো শুনছিলেন এতক্ষণ, এরপর তিনি বললেন — "হ্যাঁ হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে ডাক্তার ভুল বলছে, বা অন্য কোন গভীর ষড়যন্ত্র আছে। সুধীর, তুমি জয়ের মেডিকেল রিপোর্টগুলো সব দিও তো। আর আমি পরশু জয়ের বাড়ি যাব, একটু অবশারভেশন করব। তবে আমি তোমাদের পরিচিত হিসাবে যাবনা। যাব অন্য পরিচয়ে। আচ্ছা জয় কী কাজ করে?"

— জয় ফুটবল খেলে, ফুটবল দ্যা চ্যাম্প দলের খেলোয়াড়।

— আচ্ছা, মানে জয় চক্রবর্তী, যে শেষ ফাইনাল ম্যাচটা খেলতে পারলনা আর। সে তোমার জামাই? ওনার অ্যাকসিডেন্টটা খেলার মহলে শোকের ছায়া এনে দিয়েছে। খুব ভালো খেলতেন। সময় কখন পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেয় কেউ বলতে পারেনা। তুমি দীনুকে জয়ের নাম ঠিকানাটা দিয়ে যাও। হ্যাঁ, সুধীর মধ্যাহ্ন ভোজনটা এখানে করে যাবে।

— স্যার আজ নয়, অন্য কোন দিন। রঞ্জনাকে কিছু বলে আসিনি। মা'টা আমার বড্ড চিন্তা করবে। আমি সব রিপোর্ট আজই দীনুর কাছে পাঠিয়ে দেব। আজ তাহলে আসি স্যার।

এই বলে, সুধীরবাবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে ব্রজবাবুকে প্রণাম করে বেড়িয়ে পড়লেন। ...ক্রমশ ■



পাঠরতা আধুনিকা ভারতীয় নারী

ফটোঃ জয় দেব

সোর্সঃ https://www.pexels.com/photo/woman-reading-book-1580272/

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নারী

রাজশ্রী দত্ত

বাংলা সাহিত্যে স্রষ্টার সৃষ্টির মনরাজ্যে বহুমাত্রিক গুণ ও বিচিত্র রূপের অধিকারিণী হলেন নারী। বাংলা সাহিত্যের একেবারে প্রাক-মুহূর্ত থেকেই নারীকে কেন্দ্রবিন্দু করে সাহিত্য সৃষ্টি। 'চর্যাপদ'এ সেই নারীরূপ যেন সমাজের দর্পণ হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেই প্রথম তেজস্বিনী আত্মদীপ্ত প্রেমিকা চরিত্ররূপে 'রাধা' চরিত্রের আবির্ভাব। মধ্যযুগে যেমন 'মঙ্গলকাব্য' শাখায় দেবীচরিত্র ও স্বর্গভ্রষ্টা মর্ত্যমানবী চরিত্রগুলির সক্রিয় প্রাধান্যই কাব্যগুলির প্রধান রসনা, তেমনই সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পদ্মাবতীর শৌর্য-বীরত্বের সহিত প্রেমিকা হৃদয়ের এক গভীর মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন, মধ্য ও অন্তমধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলি উজ্জ্বল, সেখানে তাদের জয়–জয়কার বিভিন্ন রূপে ধ্বনিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে ও কথাসাহিত্যে রচয়িতাদের দৃষ্টিতে নারী চরিত্র নানাভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। একদিকে যেমন নারী-শিক্ষার উন্মেষের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্রমুখেরা তৎপর হয়েছিলেন,

অপরদিকে কবি ঈশ্বর গুপ্তর কলম আধুনিকা শিক্ষিতা বঙ্গ নারীকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেননি। তাই তাঁর বাঁকা কলমের ভাষায় লেখা হয়েছিলঃ

“আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রতধর্ম করত সবে। একা বেথুন এসে শেষ করেছে আর কি তাদের তেমন পাবে?”

তবে নারী চরিত্রকে যিনি পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে সন্মানিত করেছেন, তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর ‘মেঘনাদ বধ’ ও ‘বীরাঙ্গনা’ কাব্যে স্বদীপ্ত নারী চরিত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভোরের পাখি বিহারীলাল এক আশ্চর্য কবি মানসীর পরিকল্পনা করেছিলেন, নারীকে বসাতে চেয়েছিলেন প্রেম-করুণা-সৌন্দর্যের পীঠস্থানে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের হাতেখড়ি বঙ্কিমের সূতীক্ষ্ণ কলমে। তবে আধুনিক কালে কিছু সমালোচকের মতে বঙ্কিমের সৃষ্ট নারী চরিত্র পাপের প্রায়শ্চিত্তে ব্রতী হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী অবশ্যই স্বমহিমায় নারীত্বের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তাই ‘চিত্রাঙ্গদা’য় তাঁর নায়িকা বলে উঠেছেনঃ

“আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি।
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।”

বাংলা সাহিত্যে নারী

রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীকে দেখা যায় বিভিন্ন বিশিষ্ট ভূমিকায়। যেমন 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য চরিত্রে খুঁজে পাই এক বুদ্ধিদীপ্ত স্নিগ্ধ রূপের পরিচয়। তেমনই 'চোখের বালি'র বিনোদিনী কিংবা 'যোগাযোগে'র কুমুদিনী প্রমুখ চরিত্রগুলি আপন বিশিষ্টতায় অনবদ্য।

অপরিতৃপ্ত প্রণয়বাসনাকে বহন করে, আত্মদগ্ধ ধূপের মতো সৌরভ বিলিয়ে ক্ষয় হয়ে যাওয়া নারীর প্রতিমাকে বাঙালি মানসে স্থায়ী আসন দিতে সক্ষম হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নারীর প্রেম আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি নারী হৃদয়ের বাৎসল্যের ছবিও অনেক এঁকেছেন। রাজলক্ষ্মী ও কুসুমের জীবনযাত্রার গতি অনন্য সাধারণ। বাৎসল্য প্রীতি বিচিত্র উপায়ে এদের প্রণয় বাসনার সঙ্গে মিশে গিয়ে জটিল হয়ে পড়েছে। তাই নারী চরিত্র রূপায়ণে মৌলিকতা বিদ্যমান। রহস্যময়ী নারী চরিত্র সৃষ্টিতে অপর এক লেখক হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাম্প্রতিক কালের রচয়িতাদের মধ্যে সমরেশ বসু, সুবোধ ঘোষ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বানী বসু, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অজস্র লেখক-লেখিকা নানাভাবে নারী ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করেছেন। এই ভাবেই নারীর স্বরূপ ধীরে ধীরে বাংলা সাহিত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার হাতে সৃষ্টি যুগে যুগে এইভাবেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে। ■

জননী

অরু ভট্ট

হিংস্র নখরাঘাতে নিজেকে রক্তাক্ত করি,
তিলে তিলে পুড়িয়েছ
কামের আগুনে বারবার।
সুগন্ধ পাপড়ি ঝরিয়েছ নিজেরে ধবংস করি –
শুধু একটি ফলের আশায়।
তুমি নারী, তুমি জননী।।

উত্তরিতে লগ্নান্তর, কত ব্যথা,কত অশ্রু
নীরব, নিভৃতে গিয়াছ কেঁদে।
তিলে তিলে, পলে পলে
রক্ত, মেদ, মজ্জায় – মনের মাধুরী মিশায়ে
গড়েছ মানস পুতুলী –
দশ মাস দশ দিন ধরিয়া।
সঞ্চিত করিয়াছ অমৃত সুধা, অনাগতের তরে –
নিঙাড়িয়া জীবনরস
সলজ্জ গোপনে
তুমি ধাত্রী, তুমি জননী।। ■

দাহ

দোলা ভট্টাচার্য

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নৈশ প্রসাধন সারতে সারতে, সৌম্যকে উদ্দেশ্য করে পাঞ্চালী বলল – আমাকে কিছু টাকা দেবে?

– কত?

– এই ধর হাজার দশেক।

– আচ্ছা, এই এতগুলো টাকা নিয়ে আপনি কি করবেন যাজ্ঞসেনী! – সৌম্য মাঝে মধ্যে মজা করে এই নামেই ডাকে পাঞ্চালীকে।

– বেড়াতে যাব।

বিছানায় উপুর হয়ে শুয়ে ফোনটা নিয়ে খুটখাট করছিল সৌম্য। কথাটা শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসে বলল – কিন্তু এখন তো আমার ছুটি নেই।

– তোমাকে কে যেতে বলেছে! আমি একাই যাব।

– যাঃ। তুমি ঠাট্টা করছ নিশ্চয়।

কাপ্তানের কোমরের ফিতেটা আলগা করতে করতে বিছানায় উঠে আসে পাঞ্চালী। – না। আমি সিরিয়াসলি বলছি।

পাঞ্চালীর হিমশীতল দৃষ্টিকে উপেক্ষা কোরে সৌম্য বলে – আচ্ছা, কি শুরু করলে বলতো! আমি কি তোমাকে

কোথাও নিয়ে যাইনি! প্রতি পুজোতেই কোথাও না কোথাও যাওয়া হয়। তাই না!

– হ্যাঁ, হয়। কিন্তু সেটা কি রকম বলতো! আকাশে ঘুড়ি ওড়ার মতো, যার সুতোর প্রান্তভাগটা থাকবে অন্য একজনের লাটাইতে বাঁধা।

– ছিঃ, তুমি এভাবে ভাব! – একরাশ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে সৌম্য এই নতুন পাঞ্চালীর দিকে। শুয়ে পড়ার আগে আরও একবার মনে করিয়ে দেয় পাঞ্চালী – টাকাটা আমার চাই কিন্তু। – কোনো উত্তর না দিয়েই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে সৌম্য।

পাড়ার দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে চ্যাটার্জি ট্রাভেলসের বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়ে পাঞ্চালীর। হরিদ্বার, হৃষিকেশ, কেদার, বদ্রী, দেরাদুন, মুসৌরী নিয়ে যাচ্ছে ওরা। জনপ্রতি দশ হাজার টাকা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় পোকাটা নড়ে উঠেছিল। সারা জীবনটাই তো বাবা অথবা স্বামীর হাত ধরেই কেটে গেল। দেখাই যাক না নিজের পায়ের জোরটুকু যাচাই করে।

হাওড়া স্টেশনে এসেছিল সৌম্য, পাঞ্চালীকে গাড়িতে তুলে দিতে। জানলার ধারেই সিট পড়েছে পাঞ্চালীর। জানলার সামনে প্ল্যাটফর্মে তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সৌম্য।

সাবধানে যেও। আর প্রয়োজন হলে বাড়িতে ফোন করবে। – উত্তরে কিছু বলল না পাঞ্চালী। তীব্র আবেগে

ঠোঁট দুটো শুধু থরথর করে কেঁপে উঠল ওর। অল্প একটু মাথা নাড়ল শুধু। ট্রেনটা নড়ে উঠতে সরে দাঁড়াল সৌম্য।

এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল পাঞ্চালী। ঘোরটা কাটতেই, সে দেখল ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে সামনে এগোচ্ছে ট্রেন। পেছনে সরে যাচ্ছে সৌম্য। বুকটা ফেটে যাচ্ছে পাঞ্চালীর। মেয়েটার কথা বড্ড মনে পড়ছে। ওকেও সাথে আনতে চেয়েছিল ও। সৌম্য অনুমতি দেয়নি, অবশ্যই ওর মায়ের পরামর্শে। ভয় পেয়েছিলেন শাশুড়ি। উঠতি বয়সের মেয়ে। দিনকাল তো ভালো নয়। কোথায় কি ঘটে যায় কে জানে। বৌমা যাচ্ছে যাক, কিন্তু রিমি কে যেন না টানে।

যাওয়ার আগে সৌম্য নিজেই সব গোছগাছ করে দিয়েছে। ট্যাক্সি ডেকে এনেছে। তারপর নিজেই এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছে। অথচ এই যাওয়া নিয়ে চরম অশান্তি হয়েছে ওদের মধ্যে। পাঞ্চালীর এখন মনে হচ্ছে, অনেক হয়েছে। আর না। চেন টেনে ট্রেন থেকে নেমে পড়লে হয়। সৌম্য হয়তো এখনো স্টেশনেই রয়েছে। কিন্তু আর কি সেটা সম্ভব! ট্রেন ততক্ষণে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়চ্ছে।

মনের মেঘটা আস্তে আস্তে কেটে যেতে পাঞ্চলী দেখল, একা একা ঘুরতে একটুও খারাপ লাগছে না এখন। জীবনে এই প্রথম অখন্ড স্বাধীনতার স্বাদ পেল ও। ছোট থেকেই অজস্র অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে ওঠা, বিয়ের পরও

সেই একই পরাধীনতা। দীর্ঘদিন ধরেই মনের মধ্যে বজ্রগর্ভ মেঘের আনাগোনা চলছিল ওর।

সেদিন রাতে খেতে বসে সৌম্যর মা যখন বললেন – "বাবু, এবারে আর পুজোয় বাইরে যাসনা। তোর বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। আর আমার বুকের ব্যাথাটাও বেড়েছে। তোরা চলে গেলে সারা বাড়িতে এই দু'টি মাত্র প্রাণী। বড় ভয় করে।" অবাক হয়েছিল পাঞ্চালী। পুজো আসতে এখনও চার মাস বাকি। অবশ্য টিকিট কাটতে গেলে এখনই কাটতে হবে। সেটা বুঝেই বুড়ি আগে থাকতে গাওনা গেয়ে রাখল। তেঁতো মুখে বলেছিল পাঞ্চালী, "কেন মা, আপনার অন্য ছেলেরাও তো কাছেই আছে। ক'টা দিন তাদের কাছে গিয়ে থেকে আসুননা।"

– এই বয়সে আর ঠাঁইনাড়া হতে বোলোনা বৌমা। অন্য জায়গায় বড় অস্বস্তি হয়।

– তাহলে ওদের বলুন এখানে এসে ক'দিন থেকে যেতে।

– তা হয় না বৌমা। ওদের অসুবিধে হবে।

– আচ্ছা, কি শুরু করলে বলতো! আমি কি তোমাকে কিসের অসুবিধে! এটা তো তাদেরও বাড়ি। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঘর রয়েছে এখানে। শুধুমাত্র আমাদের ক'দিনের জন্য বাইরে যাওয়াটা আটকালে কারোও আর অসুবিধা বলে কিছু থাকবে না, তাই তো!

সৌম্য থামাতে চেষ্টা করছিল ওকে। কিন্তু থামে না পাঞ্চালী। সেদিন মনের সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিতে চাইছিল ও। – "শুনুন

মা, আপনার অন্য ছেলেমেয়েরা বলে, এই বাড়িটা আমরা ভোগ করছি। তাই আপনাদের দু'জনের এবং এই বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। তাই তো করছি। কিন্তু এই এত বড় বাড়িতে আমাদের মাত্র দু'টি ঘর। আপনার তিন ছেলেই নতুন বাড়ি করেছে। বড় আর ছোট তাদের স্বপ্নের বাড়িতে বাস করছে। কিন্তু আমরা তো নতুন বাড়িতে উঠে যেতে পারছি না আপনাদের একলা ফেলে রেখে। ওরা সক্কলে বেড়াতে যাবে। কিন্তু আমরা যেতে পারব না, আপনারা বাড়িতে একা থাকবেন বলে। কেন! কেন এরকম হবে?"

রাগের চোটে ভুলেই গিয়েছিল পাঞ্চালী, এত সত্যি কথা বলতে নেই। তাহলে ওকে খারাপ প্রতিপন্ন করতে সকলের সুবিধাই হবে।

সৌম্য এতক্ষণ চুপ করে সবটা শুনে যাচ্ছিল। আর নিতে পারছিল না ও। মনে হচ্ছিল, পাঞ্চালী কে এবার থামানো দরকার। তাই বলে উঠল – এসব অসুবিধা তো আমার। ওরা যা বলে, সে তো আমায় বলে। তুমি এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছ কেন?

চমকে ওঠে পাঞ্চালী। – "কি বলছ! আমায় কেউ কিছু বলে না! আমার সামনে কোনো কিছু ঘটেনি কোনো দিন!"

– হ্যাঁ। তা নিয়ে তোমার এত রিঅ্যাক্ট করার মতো কিছু হয়নি। আর একটা বছর বেড়াতে যেতে না পারা নিয়ে তোমার যদি এত কিছু মনে হয়, তাহলে একাই যাওনা। অনেক ট্রাভেল এজেন্সি আছে। ব্যাবস্থা করে নাও। আমাকে

টেনো না এর মধ্যে। টাকা যা লাগে দিয়ে দেব আমি। হুঁহ, একলা চলার ক্ষমতাও তো নেই।

হরিদ্বার, হৃষিকেশ ভালোই ঘোরা হল। ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে সৌম্যর বলা সেই কথাগুলো বারেবারেই মনে পড়ছিল পাঞ্চালীর। বিষাদের মেঘ এসে ঘিরে ধরছিল মাঝে মাঝেই। সৌম্য যদি ওভাবে সেদিন ওকে না বলত, তাহলে হয়তো এদিনটা আসত না।

কেদারে এসে হঠাৎ করেই আলাপ হল সমর ঘোষালের সঙ্গে। মন্দিরে পুজো দেওয়ার লাইনে না দাঁড়িয়ে একাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল পাঞ্চালী। – "আপনি পুজো দিলেন না?" প্রশ্ন শুনে ফিরে তাকাল পাঞ্চালী। এ লোকটা ওদের গ্রুপের সাথেই এসেছে। তবে পাড়ায় একে কোনোদিন দেখেছে বলে মনে পড়ছে না।

– না। অত ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। – একটু হেসে জবাব দিল পাঞ্চালী।

– ঠিক বলেছেন। আমিও ঐ জন্যই পুজো দিলাম না। আসলে কি বলুন তো, ভক্তি তো মানুষের মনে। গুঁতোগুঁতি করে পুজো দিলেই কি আর ভক্তির প্রকাশ হয়! এটাই তো বোঝেনা মানুষ। – মৃদু হাসল পাঞ্চালী।

– কি! আমি ভুল বলেছি কিছু! বলুন।

– না। আপনি একদম ঠিক বলেছেন।

– আসুন না, আমরা ওই ঝর্ণাটার ধারে গিয়ে একটু দাঁড়াই। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

শাসিতা

মধ্যবয়সি সমরকে পথের সাথি নির্বাচন করতে অস্বস্তি বোধ করেনি পাঞ্চালী। সমরের সাথে বন্ধুত্ব হবার পর থেকে পাঞ্চালী প্রতি পদক্ষেপে বুঝতে পেরেছে, মানুষটা কতটা নির্ভরযোগ্য। বাকি দিনগুলো আর একবারও একলা মনে হয়নি।

বাড়ি ফিরতে আবার সেই বিরক্তিকর পরিবেশ। সৌম্য যথারীতি অফিসে গেছে। বিরক্তি চরমে উঠল পাঞ্চালীর। আজ ও ফিরবে জেনেও একদিনের জন্য অফিস থেকে ছুটি নিতে পারল না! স্নান সেরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল ও। খানিক বাদেই আবার হেঁসেল ঠেলতে যেতে হবে। এই ক'টা দিন কাজের বৌটাই সামলে দিয়ে গেছে।

"ও বৌমা। শুয়ে পড়েছ? ক্লান্ত নিশ্চয় খুব?" – সৌম্যর মা সরজুদেবী পাঞ্চালীর বিছানার পাশে এসে বসলেন। – "তোমার জন্য এই মিষ্টি আর সরবতটুকু নিয়ে এলাম।"

প্রবল বিরক্তিতে মনটা ছেয়ে যায় পাঞ্চালীর। বাড়িতে ভাল কিছু রান্না হলে যে শাশুড়ি সবার সামনেই বলে উঠত – "আমার ছেলে আর মেয়েরা পেট ভরে খাবে। আর বৌরা চাখবে।" তখন বাড়িতে ছিল দু'টি মাত্র বৌ। তাদের ভাগ্যে শুধু চেখে দেখা। অথচ বানাবে বৌরা, সার্ভ করবে বৌরা। কোনদিনই বৌদের খুশি নিয়ে উনি মাথা ঘামান নি। তাহলে আজও নিশ্চয়ই ওকে খুশি করতে আসেননি উনি।

রাতে সৌম্য বাড়ি ফেরার পর আর এক প্রস্থ অশান্তির ঝড় বইয়ে দিল পাঞ্চালী। "আজ আমি আসব জেনেও

একটা দিন কামাই করতে পারলে না! যাবার আগে কতবার ফোন করার কথা নিজেই বললে। অথচ আমার ফোন রিসিভ করা তো দূরের কথা, নিজেও একটা ফোন করলে না। আমি পৌঁছনোর পর থেকেই সমানে ফোনে ট্রাই করে যাচ্ছি তোমাকে...” – চোখে জল এসে যায় পাঞ্চালীর।

অসীম ধৈর্য্য সৌম্যর। মৃদু হেসে বলল, “বেড়িয়ে এসেও মন ভাল হল না যাজ্ঞসেনী!” – রাগে চিৎকার করে উঠল পাঞ্চালী – “আমার মনের খবর কবে রেখেছো তুমি? তোমার বাবা মায়ের সুবিধার্থে আমি একা বাইরে গেছি। বুঝেছ? একদম একা। আর কেউ আমার মত একা আসেনি। বুঝতে পেরেছো তুমি?”

– একা কেন! শুনলাম সমরদা তোমার সাথে ছিল। খুব যত্ন করেছে তোমার? তাতেও একাকীত্ব ঘোচেনি! স্তব্ধ হয়ে গেল পাঞ্চালী। সৌম্য তখন বলে চলেছে – “পাড়ার মোড়ে দেখা হল চ্যাটার্জি ট্রাভেলসএর তপনের সাথে। ওর কাছেই যাচ্ছিলাম বাকি টাকাটা দিতে। ওর কাছেই শুনলাম।”

– সমরদাকে চেন তুমি?

– কেন চিনব না! আমরা একই কলেজে পড়তাম। আমার থেকে দু’বছরের সিনিয়র। মেয়েদের সাথে ফ্লার্ট করতে ভালবাসত। এখনও দেখছি সে স্বভাব যায়নি।

এখন গভীর রাত। একটা বেজে গেছে বোধ হয়! তিনতলার ছাদে একাই বসে আছে পাঞ্চালী। আজ কত কথা

মনে পড়ছে। বাবা মা আর দুটি সন্তানের ছোট্ট পরিবার থেকে এসে এতগুলো জা, ভাসুর, দেওর, ননদের সংসারে আজ ও হাঁপিয়ে উঠেছে। সকলেই একে একে চলে গেছে এ বাড়ি থেকে, নিজেদের সুখ সুবিধা খুঁজে নিয়ে। রয়ে গেছে শুধু সৌম্য। সৌম্য নিজেও বাড়ি করেছে একটা। সে বাড়িতে আজও যাওয়া হয়ে উঠল না। বাকিরা আছে ওদের মাথায় ছড়ি ঘোরানোর জন্য। এ বাড়িতে পা দিয়ে ইস্তক দেখেছে, তিন ভাইয়ের মধ্যে বাক্যালাপ নেই। তাই বাড়ি ঢুকতেই নতুন বৌকে ঢোকানো হল বিপক্ষ শিবিরে। বিয়ের এতদিন পরেও এ বাড়ির অর্ধেক মানুষ ওর সাথে কথা বলে না। আর বাকি অর্ধেকের সাথে শাসক – শাসিতের সম্পর্ক। ওকে শাসন করার দায়িত্ব তারা নিজেরাই বুঝে নিয়েছে।

ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কোন বাড়িতে না হয়! কিন্তু ছোটবেলার ঝগড়া এমন জিইয়ে রাখা কোথাও তো শোনেনি ও। ছেলেদের শাসন করতে পারেন নি ওদের মা! শেখাতে পারেননি ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া মিটমাট করে নিতে হয়! সমরদা যে সৌম্যর বন্ধু সেটা পাঞ্চালীও জানত। প্রথম পরিচয়েই সমরদা বলেছিল ওকে। তীব্র অভিমানে সৌম্যকে সেকথা বলেনি পাঞ্চালী।

সমরদার সাথে পথের বন্ধুত্ব পথেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোথা থেকে কি শুনে এসে আজ তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে সৌম্য! নারী পুরুষের মধ্যে শুধু কি একটাই

সম্পর্ক হয়! বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে নেই! বেড়াতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে ও অনুভব করেছে, ওকে নিয়ে কানাঘুষো হচ্ছে। স্বামী সন্তানকে ছেড়ে একা এসেছে ও। তার ওপর সমরদার বন্ধুত্ব, অনেকের বুকেই জ্বালা ধরাচ্ছে। সামান্য টুকরো কথা, একটু হাসি, পাহাড়ী পথে সাহায্যের জন্য একটু হাতটা বাড়িয়ে দেওয়া, এতেই গেল গেল রব!

আজ সকলে মিলে ওকে ভিলেন বানিয়ে তুলেছে। বাইরের আচরণটাই তো সকলে দেখে। কিন্তু সেই আচরণের কারণ তো কেউ খোঁজার চেষ্টা করে না! সব চাইতে বড় কথা, এ বাড়ির মানুষগুলো কেউ ভালবাসতে জানেনা। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের সন্তানকেও চাকর বানিয়ে রাখতে দ্বিধা করে না এরা। আর শাসন করতে খুব ভালোবাসে। এই অপছন্দের সংসারে একেবারেই বাঁচতে ইচ্ছা করে না পাঞ্চালীর। কিন্তু মরার অধিকারও তো ওর নেই। মেয়েটাকে একটা পছন্দের জীবন দিতে হবে। এখন সেটাই ওর একমাত্র ইচ্ছা, মেয়েটাকে যেন ওর মতো অপছন্দের সংসারের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে না হয়। ■

বিশেষ ঘোষণা

গুঞ্জনে প্রতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্তই পরের (মাসের) সংখ্যার জন্য লেখা গ্রহণ করা হয়।

বন্দনা

সরজিৎ মণ্ডল

কয়েকদিন আগে আমার মা মারা গেলেন। মনটা ভীষণ খারাপ। যে মা আমাদের পৃথিবীর আলো দেখালেন আর এত কষ্টের মধ্যে লালন-পালন করে বাঁচার মতো বাঁচালেন, তাঁকে আমরা ঠিক সেভাবে দেখতে পারলামনা। এক প্রকার বিনা চিকিৎসাতে মাকে চলে যেতে হয়েছে, তা ভেবেই নিজেকে ভীষণ দোষী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অকৃতজ্ঞের মতো চাকরি নিয়ে প্রবাসে পড়ে থেকে দিনের পর দিন মাকে উপেক্ষা করেছি। সন্তানের প্রতি তাঁর আকুতিকে কোন গুরুত্বই দিইনি।

মায়ের সাহিত্য প্রীতি আমাকে একটু লিখতে শিখিয়েছে। তাই গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো করার মতো মাকে হারানোর ব্যথা নিয়ে কিছু লিখে কিছুটা কৃতজ্ঞতা দেখাব ভেবেছিলাম। কিন্তু তাও বোধহয় হবেনা। কারণ, গতকাল মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যার সাথে দেখা হয়েছে, আমার মন আগে তাকে নিয়ে কিছু লেখার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

যদিও তার মহৎ ত্যাগের কথা আগে শুনেছিলাম, তবুও তার সাথে আমার আগে দেখা হওয়ার সুযোগ হয়নি। এবার হল। তাও আবার গ্রামের বাড়িতে মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের

স্নেহ

দিনেই। সে যা হোক, দু'দিন সে আমাদের সাথে কাটিয়েই এত কিছু উপকরণ দিয়ে গেল – যে তাকে নিয়ে আমাকে লিখতে বসতেই হচ্ছে।

সে কে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মাত্রই অনেকে বলবেন, ওঃ! তাই? ঠিকই ভেবেছি, এরকম কাউকে দু'দিন কাছে পেয়ে কোন্ মানুষ মাকে বা অন্যকে নিয়ে লিখবে শুনি? আরে বাবা, সবাই এক গোত্রের মানুষ। সবই বুঝি...

কিন্তুনা, এখনো তার সাথে আমার সম্পর্ক সোজা বলতে পারছিনা। বরং ব্যাপারটাতে আরও ধাঁধা জড়িয়ে দিয়ে বলি, ও আমাকে এই দু'দিন যে মিষ্টি সম্বোধনে ডেকেছিল তা ভাবতে পারিনি। একেবারে আনমনা হয়ে তার ও ডাকের অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছি। পরে অবশ্য তার একটা কারণ নিজেই খুঁজে পেয়েছি। হ্যাঁ, সেটা বলব নিশ্চয়। এখন দেখিনা, আপনারা আর কী ভাবতে পারেন? তবে আমি সুনিশ্চিত যে, তার সম্বন্ধে যে কাহিনী এখন বলব, তা জানার পর আপনারা তার নাম নিয়ে নিশ্চয় "বন্দনা" করবেন!

এই দেখলেন তো, কথা প্রসঙ্গে তার নাম বলেই ফেললাম। হ্যাঁ, বললাম, সে একজন মেয়ে এবং তার নাম "বন্দনা"। তবে তাকে মেয়ে না বলে মহিলা বলাই ভাল। মধ্য বয়স্কের কাছাকাছি বা তার নিচে তার বয়স। যদিও সে কিছুটা কালো ও তার শরীরে সে জৌলুস নেই, কিন্তু দেহমনে তার শক্তির যে অভাব নেই তা নিঃসন্দেহে বলা

যায়। আর তার হৃদয়! না-না, সেটা এখনই বলতে পারবনা। অত তাড়া ভালো নয়।

মেয়েটি সম্পর্কে আমার শালী বা শ্যালিকা। আমার বৌ এর এক সময়ের বড় আদরের বোন। ব্যস, এবার আপনাদের আর থামাতে পারলামনা। অর্থাৎ, আপনারা অনড় রইলেন আপনাদের চিন্তাধারায়। মানে – না, আমার আজকের গল্প আপনাদের সে ভাবনাতে জল ঢালল। কেন বলছি, তা জানতে চান? তাহলে আসুন আমার সাথে।

শ্যালিকা হলেও বন্দনার সাথে যেহেতু আমার দেখা হল এই প্রথমবার, তাই, ওকে নিয়ে গল্প লিখতে যাওয়া মানে একটু ভাবতে হয়ত হত, কিন্তু তা হলনা, কারণ, ওর কাহিনী যে আগেই শুনেছিলাম, তা একটু আগেই আমি আপনাদের বলেছি। বস্তুতঃ, সে কাহিনী না শুনে কারোর উপায় থাকেনা। অন্ততঃ, যাদের হৃদয় আছে তারা তার সে কাহিনী শুনে কক্ষনো ভুলবে না। আর যে কোন ভাইতো আজীবন এরকম একজন দিদিকে মনে রাখবে। কিন্তু এভাবে তার কাহিনীকে তকমা না দিয়ে বা আর ভনিতা না করে সোজা বলে তার গুরুত্ব আপনাদের হাতে তুলে দেওয়াই যে শ্রেয় হবে, তা মেনে নিয়ে এগোনো যাক।

কাজ ঘরে বন্দনাকে কাছে পেয়ে আমার লেখার কাজটা আরও সহজ হয়ে গেল। কাজটা সহজ হওয়ার আর একটা কারণ হল, ওর স্বামী ও এক ছেলেকে ঐ অনুষ্ঠানে পেয়ে।

অর্থাৎ, লোকের মুখে ঝাল না খেয়ে নিজে তা ভালোভাবে জেনে নিয়েই এ গল্প লিখতে বসেছি। এর মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যে থাকার সম্ভবনাও রইলনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "দেনা-পাওনা" গল্পে সাত ভাইয়ের কোলে যখন নিরুপমার জন্ম হয়েছিল, তখন তার উপর ভাইদের যে কী পরিমাণ ভাব-ভালবাসা জন্ম নিয়েছিল, তা লেখক স্পষ্ট করে বলেননি। কারণ, স্পষ্ট জিনিস বিশদ ভাবে বলার দরকার হয়না। সুতরাং, বন্দনারা ছয় বোনের পর যখন একমাত্র ভাইকে পেল, তখন সে ভাইতো আর সাধারণ হলনা... মা-বাবার চেয়ে বোনেরাই খুশি হল বেশি। আর এই বন্দনাতো বোধহয় খুশির সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল!

বন্দনা সেজো বোন ছিল। তার আগে তার দুই বোনের কেবল বিয়ে হয়েছে। এবার তার পালা। এমনিতেই ওরা গরীব ছিল। মাত্র দু'বোনের বিয়ে দিতেই ওর মা-বাবা যেভাবে নিঃস্ব হয়ে গেছিল তা বন্দনা দেখেছিল। বন্দনা দেখেছিল, বর পণের টাকা যতদিন না তার মা-বাবা দিতে পেরেছিল, ততদিন তার জামাইবাবু তার বড় দিদিকে তাদের বাড়িতে ফেলে রেখেছিল। নিয়ে যায়নি। বিয়ের পরেই প্রায় এক বছর দিদি তাদের ঘরে কেঁদে কাটিয়েছে। তারপর, একদিন হঠাৎ তার জামাইবাবু তাদের ঘরে আসে এবং দিদিকে না নিয়ে তার বাবার গরু দুটোকে খুলে নিয়ে চলে যায়। দিদি সেদিন গরু দুটোর মতো নিজে বন্ধন মুক্ত

হয়ে স্বামীর সাথে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। দিদি অনেক কেঁদেছিল। পরে দিদি একদিন নিজে গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ওঠে।

সুতরাং, বন্দনা বেশ ভাল মতোই বুঝতে পেরেছে, যে, কারোর সংসারে এরকম ছয় মেয়ে সন্তান থাকলে তাদের বিয়ে দিতে এই বর্তমান অর্থলোলুপ সমাজে বর পণের আঘাতে ঘায়েল হতে হতে যেকোন মা-বাবা ফকির ও দুঃস্থ হয়ে যাবে বা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। বন্দনা মা-বাবা আর ভাই ও বোনেদের এতটাই ভালোবাসত যে, এতসব ভাবনা মাথায় রেখে, মা-বাবার সংসার থেকে নিজের বিয়ের জন্য এক পয়সাও খরচ করতে রাজি হলনা। ফলে সে জেদ ধরল, বরপণ না নিয়ে যে ছেলে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে তাকেই সে বিয়ে করবে। বন্দনা এতদিনে এটাও বুঝে গেছে যে, কোন ছেলেই তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। যে সুজিৎ তাকে এত ভালোবাসত, সেও সময় বুঝে কেটে পড়েছে। হঠাৎ, সুজিৎ জানিয়ে দিয়েছে, বন্দনাকে সে কখনো বিয়ে করতে পারবেনা। যোগাযোগ রাখা এক প্রকার বন্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং, সমস্ত ছেলে জাতটাকে বন্দনার জানা হয়ে গেছে। সে ঠিকই করে নিয়েছিল, বিয়ে করবেনা। মা-বাবা ও আদরের ভাই-বোনেদের সাথে সারা জীবন কাটিয়ে নেবে।

কিন্তু নিয়তির ছক ছিল অন্য। তাই, হঠাৎ কোন এক গ্রামের এক গরীব চাষীর ছেলের সাথে একদিন বন্দনার

স্নেহ

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর বন্দনা বুঝে গেল, কেন ছেলেটি টাকা না নিয়ে বিয়ে করেছে? কিন্তু, তখন আর তার শুধরানোর কোন অবকাশ রইলনা। বরং খুশিমনে তাকে মেনে নিল। অর্থাৎ, বন্দনার সংসার জীবন শুরু হয়ে গেল। বন্দনার স্বামী, দেবানন্দ শরীরের যোগ্যতা বেশ কিছুটা হারিয়েছিল, ছোটবেলায় দু'দুটো বড় দুর্ঘটনায় পড়ে। অবশ্য সে দুর্ঘটনা যে তারই আমন্ত্রিত ছিল তা না বললে ঠিক বোঝা যাবেনা। তাই, বলতেই হয়।

গরুর গাড়িতে মানুষ যে চাপা পড়তে পারে তা বোধহয় সংবিধান লেখার সময় বাবা আম্বেদকর ভাবতে পারেননি। আর তাই, সংবিধানে সে সম্বন্ধে বা তার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা নিয়ে কোন ক্ষতিপূরণের কথা লেখেননি। কিন্তু, এই দেবানন্দ একদিন শুকনো ক্ষেতের মাঠে আহত হোল নিজেরই গরুর গাড়িতে চাপা পড়ে। কেন চাপা পড়ল, তা বলার দরকার নেই। কিন্তু না বলে পারছিনা, "এ কেমন মানুষ? হ্যাঁ," সে কেমন মানুষ বলতে গেলে তার দ্বিতীয় দুর্ঘটনার কথাটাও বলতে হয়। ইঙ্গুয়াল হার্নিয়া অপারেশনের পর ডাক্তারি মতে ছেলেদের সাধারণত বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হয়। কিন্তু, এই দেবানন্দ কাকে খুশি করতে জানিনা, তার ওই হার্নিয়া অপারেশনের এক সপ্তাহ পরেই সাইকেল চালিয়ে দূরের শহরে চলে গেল। সুতরাং, দেবানন্দ যে সাধারণ নয় – তা এবার আপনারাও বেশ বুঝতে পারছেন।

অবশ্য তার অসাধারণত্ব বোঝাতে এখনো কিন্তু আসল কথাটাই বলা হয়নি। গরীবের ঘোড়া রোগের মতো তার ছিল দৈনিক মদ্যপানের নেশা। দেবানন্দের মহানন্দে দৈনন্দিন সুরা পান তাদের সংসারের ভরাডুবি আটকাতে বারবার ব্যর্থ হতে লাগল।

একে একে বন্দনার দুটি ছেলে হল। ছেলে দু'জন অবশ্য দেখতে খুব সুন্দর হল – এবং মায়ের মতোই দেহমনে তাদের সজীবতা ফুটে উঠল।

কিন্তু যে সংসারে বাবা এরকম মদ খায়, তার ছেলেরা আর কতদিন ভালো থাকতে পারে? তারপর যদি গরিবিয়ানা তাদের চেপে ধরে তাহলে আর যাই হোক, এই বিষয়ী বর্তমান সমাজে তার ছেলেদের যে লেখাপড়া হবেনা, তাতো যে কেউই বুঝতে পারে। হ্যাঁ, বড় ছেলেটি কোনরকমে ক্লাস নাইনে উঠে বইগুলো তুলে রাখল। আর ছোট ছেলেটি নামে মাত্র পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ একদিন, বড় ছেলেটি গ্রামের কোন এক কাকুর হাত ধরে নাগপুরে পাড়ি দিল, কিছু কাজের আশায়। কিন্তু, তার সেই সামান্য রোজগারে যখন সে কাকু গোপনে ভাগ বসাতে লাগল, তখন তার পক্ষে সেখানে রোজ দু'বেলা আধপেট খেয়ে দিন কাটানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই সে একদিন আবার বাংলায় তার সেই গ্রামে মা-বাবার কাছে ফিরে এল।

স্নেহ

কিছুদিন বাইরে থাকায়, বড় ছেলেটির চোখ খুলে গিয়েছিল। রঙিন দুনিয়া সে দেখে এসেছে। সুতরাং, হাতে যে টাকা পয়সা দরকার, তা সে জেনে গেছে। তাই সে গ্রামে এসে একটা দোকানে বাইক সারানোর কাজে লেগে গেল। তারপর বয়সের তাড়নায়, রাতারাতি টাকা হাতে পেতে গেলে যা করতে হয়, তা সে করে বসল। মানে, সেই বাইকের দোকানের মালিকের টাকার ব্যাগ হাতড়ানোর সময় সে হাতেনাতে ধরা পড়ল। সুতরাং, তার চাকরিই শুধু গেলনা, আর কোথাও কোন কাজ পাওয়ার সম্ভবনাও বিলীন হোল। আর তার মা-বাবার মান-সম্মানও মাটিতে মিশে গেল। তারপর থেকেই ছেলেটি রোজ ক্লাবের ঠেকায় আড্ডা মারে। সম্পূর্ণ বেকার হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

এভাবেই চলে যাচ্ছিল বন্দনাদের দুঃখের সংসার। হঠাৎ একদিন বিধি বাধ সাধল। জানা গেল, বন্দনার ভাই কলুর একটা কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছে। সম্প্রতি, সে কোন মদের দোকানে কাজে ঢুকেছিল। আর সেখানে, এমন মদ খেত যে, তারএকটা কিডনিই বিকল হয়ে গেল।

ডাক্তারের কথামতো কলুর কিডনি পাল্টাতে হবে। কিন্তু এত টাকা বন্দনার মা-বাবা পাবে কোথায়? এই মাত্র কয়েক দিন আগে, তারা প্রায় মরেমরে কোনরকমে একএক করে সব মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করেছে। এখন তাদের হাতে টাকা কোথায়?

স্নেহ

শুনেছি ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে। এতদিন পর্যন্ত জানতাম, সে ভালোবাসা হয় মা-বাবার সন্তানের প্রতি বা প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি। কিন্তু কক্ষনো শুনিনি, ভাইবোনের স্নেহ-মমতার ভালবাসাও মানুষকে অন্ধ করতে পারে। হ্যাঁ, বন্দনা, ভাইয়ের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন দিতে রাজি হল। অর্থাৎ, ডাক্তারকে নিজে গিয়ে জানাল যে, সে ভাইয়ের জন্য নিজের একটা কিডনি দান করবে।

বন্দনা একবারও ভাবলনা, তার নিজের জীবন ও সংসার ছেড়ে – সে কত বড় একটা ঝুঁকি নিতে চলেছে। সে পাগলের মতো স্নেহ-মমতায় অন্ধ হয়ে, গোপনে রাতের অন্ধকারে জীবনটাকে হাতে নিয়ে একলা শ্বশুরবাড়ি থেকে রওনা দিল কলকাতার সেই নার্সিংহোমের উদ্দেশ্যে, যেখানে তার জীবনের অর্ধেক, মানে তার প্রাণের একমাত্র ভাই কিডনির অভাবে জীবন যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এক প্রকার একরোখা বন্দনা পরের দিন সকালে যথা সময়ে সেই হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার এহেন সাহস ডাক্তারদেরকেও তাক লাগিয়ে দিল। ডাক্তাররাতো রীতিমতো তাকে বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, কত টাকা সে নিচ্ছে তার মা-বাবা বা ভাইয়ের কাছ থেকে, এই কিডনি বেচার জন্য। ডাক্তারদের বারবার প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারলনা ঠিক করে। কেবল বলে চলল, দয়া করে আমার ভাইকে বাঁচান। শেষে, ডাক্তাররা তার ঠিকমতো বয়ান নিয়ে, তার একটা কিডনি কেটে তার ভাইয়ের শরীরে জুড়ে দিল।

ভাই বেঁচে ফিরল। দেখল, দিদি কত শান্তিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অসম্ভব যন্ত্রণা চেপে বন্দনা হাসি মুখে ভাইকে পাওয়ার আনন্দে মেতে গেল।

কিন্তু ঈশ্বর বোধহয় সে আনন্দ বেশিদিন মেনে নিতে পারলেননা, তাই বন্দনার হাসি কেড়ে নেওয়ার একটা সহজ উপায় বেছে নিলেন। কলুর অন্য কিডনিটাও খারাপ হয়ে গেল।

বন্দনা পারলে তার অন্য কিডনিটাও হয়তো দিয়ে দিত। কিন্তু তা আইনতঃ গ্রাহ্য হলনা। ফলে, যমরাজের ইচ্ছাই পূর্ণ হল। কলু মারা গেল। বন্দনা চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার দুঃখ কোনরকমে কমাতে লাগল।

এই সময়টা হয়ে উঠল বন্দনার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। একদিকে ভাইকে হারানো – আর অন্য দিকে স্বামী ও সন্তানের কাছ থেকে রোজ মারধোর ও গালমন্দ খাওয়া। জানিনা, এ সময় মানুষ কী করে! বন্দনা ছেড়ে দিল নিজেকে নিয়তির ওপর, আর মুখ বুঝে সব কষ্ট সহ্য করতে লাগল।

শুনেছি, এই সময়, মদের পয়সা পেতনা বলে তার স্বামী তার কিডনি তোলার কাটা অংশে মারত, আর বন্দনা তা সহ্য করত। এমনকি, তার বড় ছেলেও এ ব্যাপারে কম যায়নি। সেও নাকি মাকে মারত। এসব বলতেও আমার কষ্ট হয়, কিন্তু এসবই হয়েছে, বন্দনার সেসব দিনগুলিতে।

লোহা পেটাই খেয়ে খেয়ে যেমন শক্ত স্টীলে পরিণত হয়, তেমনই বন্দনা অচিরেই আরও শক্ত হওয়ার শক্তি

পেল। সে বুঝতে পারল, এভাবে হেরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং, সে আবার রুখে দাঁড়াল। নিজেই ছুটে গেল সরকারি হাসপাতালে। আর সেখানে, ডাক্তারের কথামতো চেক-আপ করাতে লাগল নিজেকে। অবশ্য, দ্বিতীয়বার দেখানোর পরই সে বুঝে গেল, সে ডাক্তারের এত আগ্রহ কেন তার প্রতি? বন্দনা, তৃতীয়বার চেক-আপের দিনে সে ডাক্তারের ফাঁদে যখন প্রায় আটকে যাবে, ঠিক তখনই সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

তারপর, কাউকে কিছু না বলে একাই ছুটে যায় কলকাতায় সে হাসপাতালে, যেখানে সে কিডনি দান করেছিল। সেখানে ডাক্তারের ফ্রি চিকিৎসা এবার পেল ঠিকই, তবে তারা যে আর ফ্রি চিকিৎসা করবেনা, তাও জানিয়ে দিল দ্বিতীয় দিনেই। বন্দনা তখন কাঁদতে লাগল। ওর কান্না ও দুঃখ বুঝে এক সহৃদয় ডাক্তার তখন ওকে এক পরামর্শ দিল। না, খারাপ নয়, এবার সে ভালো পরামর্শই পেল।

বন্দনা সে ডাক্তারের কথামতো, তার ভাইকে দেওয়া কিডনি যে ফ্রি ডোনেশান ছিল, তার উপযুক্ত প্রমান সমেত বয়ানপত্র বা সার্টিফিকেট তৈরী করাল। তারপরই সে সার্টিফিকেট নিয়ে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে গেল। কেউ ভাবতেও পারেনি যে, সে এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। বন্দনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে

যে কোন সরকারি হাসপাতালে কিডনি সংক্রান্ত আজীবন ফ্রি চেক-আপের অনুমোদন ও পাশ পেল।

ফ্রি চিকিৎসার পাশ পেলেই তো আর জীবন চলবেনা? জীবন যে আরও অনেক কিছু নিয়ে জড়িত? স্বামী-সংসার-সমাজকে নিয়ে বেঁচে থাকা যে জীবনের বড় লড়াই? সুতরাং, কয়েকদিনের মধ্যেই সে আবার জীবনযুদ্ধের বাকি লড়াই সামলাতে ব্যস্ত হয়ে গেল।

"সংসার সমর মঞ্চ" নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই বন্দনা এতদিন ঠিকমতো না বুঝে ফেলে রাখা সবচেয়ে দরকারি কাজটি সম্পন্ন করল। হ্যাঁ, ওর কৌশলী ও কার্যকরী পরামর্শে ও ভালবাসায় ওর স্বামী এখন মদ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটা যে খুবই সফলতা তা ওর স্বামীকে দেখেই বুঝেছি।

লড়াকু বন্দনাকে এখন দেখলে কেউ বলতে পারবেনা যে, তার একটা কিডনি নেই। বরং, সে এখন আরও বেশি মজবুত। সে শুধু চাষবাসের বা মাঠের কাজই করেনা, কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করতে ছুটে আসে। গ্রামের সবাইতো কলকাতায় কোন ডাক্তার দেখাতে বা ভর্তি হতে গেলে আগে তার কাছে ছুটে যায় – আর বন্দনা ও সঙ্গে সঙ্গে তাকে সঙ্গ দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

গল্প এখানে শেষ হতে পারত। কিন্তু হলোনা, কারণ, বন্দনা যতদিন এই পৃথিবীতে থাকবে – ততদিন ওর গল্প আরও

সংযোজিত হতে থাকবে। হ্যাঁ, তারই একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে আপাতত আমি আমার আজকের গল্প শেষ করব।

কাজ ঘরে বন্দনার সাথে আমার দেখা হওয়ার পর থেকেই ও আমাকে “ভাই” সম্বোধনে ডেকেছিল। হ্যাঁ। কেন ভাই বলত, এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয় তা বুঝে গেছেন। ভাইকে হারিয়ে, দুনিয়াতে ও আর এক ভাই খুঁজছে বুঝে আমি ওর সে ডাকে সাড়া দিই। আমার মন ওকে নিয়ে ভাবতে থাকে। তাই, আমি ওর আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াতাম। আমার রঞ্জন রশ্মির চোখ ওকে স্ক্যান করে দেখতে পেত, ওর কিডনির ওই কাটা অংশ, কেমন শান্তিতে আছে। আমরাই যেন বেশি চিন্তান্বিত।

মায়ের ভোজ বাড়ীতে আমরা রাজনীতির স্থানীয় বিধায়ক মহাশয়কে আমন্ত্রণ করেছিলাম, সৌজন্যতা বজায় রাখতে। আর উনিও সে সৌজন্যতা বজায় রাখতে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে, একেবারে রাতের বেলায়। এরকম রাতে এভাবে সাহস নিয়ে যে তিনি আমাদের বাড়িতে আসবেন তা বুঝতে পারিনি। যা হোক, সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে তিনি এলেন আর আমরাও সমাদরে তাঁকে বরণ করলাম। বিধায়ক মহাশয় অনেক ভাল ভাল কথা বললেন। আমরাও খুশি হয়ে হয়ে সে সব শুনলাম।

ভেবেছিলাম, এই অবসরে বন্দনা আমাদের সামনে এসে বিধায়ককে ওর বৃক্কদানের কথা বলে কিছু সাহায্য আদায়

করে নেবে। কিন্তুনা, সে আসেনি। পরে বিধায়ক চলে যেতে বন্দনাকে বলেছিলাম, কেন তুমি সামনে এসে বিধায়কের কাছে কিছু চাইলেনা? ও বলল, সেটাকি ঠিক হত? এইসময়, এরকম সুযোগ নেওয়ার কথা ওনার ভালো নাও লাগতে পারত।

ভেবে দেখলাম, বন্দনাই হয়তো ঠিক! সবসময় সুযোগের ব্যবহার করাটা অনেকটা স্বার্থপরতার লক্ষণ।ও যে স্বার্থপর নয়...

সাধারণ মানুষ অবশ্য বন্দনাকে বোকা বলে... ■

নষ্ট নারীত্বের ইতিকথা

সংযুক্তা চ্যাটার্জী

(১)

বেলা পড়ে এসেছে। গাড়ি দ্রুত ছুটে চলেছে ময়াল সাপের মত মসৃণ সড়কের ওপর দিয়ে। নগর শেষ হয়ে ক্ষেত। ক্ষেত শেষে কাশবন। কাশবন পেরিয়ে শালের জঙ্গল। ঘন নিবিড়। গাড়ির চালকের আসনে এক শালপ্রাংশু দেহের পুরুষ আসীন। পিছনের আসনে তিনটি নারী। বসন আলুথালু। বোঝা যায় শক্তি প্রদর্শন হয়েছে তাদের ওপরে। এখনো নারীত্বের লাঞ্ছনা হয়নি হয়তো। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের কাছে নারীর সম্মানের মূল্যই বা কি?

উত্তর ভারতের এক নগরী। সময়কাল অজানা। খাপ পঞ্চায়েত তার রায় ঘোষণা করেছে আজই। সাধারণ সভা ছিলো না আজ। এই জঙ্গলের দুই ধারের ,দুই নগরীর ভূস্বামীদের বিবাহ সংক্রান্ত ঘোষণা ছিল আজ। ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সভায় বিচারক হিসাবে যোগদান করতে এসেছিলেন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ। রায়দানের পূর্বে পূর্ণ বিবরণ আবার বর্ণিত হয় তাদের সামনে।

(পাঠকের সুবিধার্থে দুই নগরীর আয়তন অনুযায়ী ছোট নগরী এবং বড় নগরী হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।)

ভ্রম

(২)

ছোট নগরীর ভূস্বামীর তিন কন্যা। প্রথমা কোনো সাধারণ নারী নয়। স্বাধীনচেতা, শস্ত্রবিদ্যায় নিপুণা। যে কোনো যুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বুদ্ধি এবং উপস্থিতবোধের সাহায্যে হেলায় হারিয়ে দেয় উচ্চ শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষদের।

নগরীর শেষেই শালের অরণ্য। প্রথমা মাঝে মাঝেই হারিয়ে যায় সেখানে। না, শিকার সে করে না। প্রাণীদের বড়ো ভালোবাসে। সুযোগ পেলেই ছুটে যেতে মন চায় অরণ্যে। কোথাও আকাশচুম্বী বৃক্ষরাজি, তো কোথাও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের বাহার। কত জানা অজানা পশুর ভিড়। পাখপাখালির কলতান। অজানা পুষ্পসম্ভার। নাম না জানা কীট পতঙ্গ। বড়ো আকর্ষণ। কোনো ক্ষেত্রে কোনো বাধা নিষেধ নেই পিতার।

তখন যৌবন সবে কড়া নেড়েছে দুয়ারে। যেমন অপার স্বাধীনতা তেমনই অসম্ভব কৌতূহল। এমনি কোনো একদিনে...

সেদিন অরণ্য দুহাতে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। উঁচু গাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে ঝরে পরা শিশিরে স্নান করে মনটা আদুরে হয়ে উঠেছিল। লম্বা লম্বা আম পল্লব হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল তার মাথায়। একটা হরিণ ছানা তার পিছন পিছন ঘুরতে ঘুরতে একমনে তার বসনের খুট চিবচ্ছিলো। চঞ্চল মনটা আর দেহে ছিল না। পৃথিবী ছাড়িয়ে এক অসীম শুন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কোনো এক অজানা চিন্তায়।

ভ্রম

এমন সময়...

ঠিক এমন সময় এক প্রাচীন বৃক্ষের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো এক অনিন্দ্যকান্তি যুবা পুরুষ। বৃক্ষশাখার একটি বসন্তবৌরি পাখি ছিল তার অস্ত্রের লক্ষ্য। সকালের সূর্যস্নাত পৌরুষ দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে গেল প্রথমা। পক্ষীপ্রেমী নারীর করতালিতে শেষ মুহূর্তে ডানা মেলে হারিয়ে গেল বসন্তবৌরি। রাগত পুরুষ শব্দের উৎস সন্ধানে ফিরে তাকালেন। পুরুষবেশে অসাধারণ সৌন্দর্যবতীকে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। চুম্বকের ন্যায় আকর্ষিত হলো। প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম কি একেই বলে!

####

এরপর অনেকগুলি পূর্ণচন্দ্র অতিবাহিত। দুজনের পারস্পরিক একটা গাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শাল পিয়ালের আনাচে কানাচে। শারীরিক ঘনিষ্ঠতাও তার অংশবিশেষ। যৌবন চলেছে তার নিজের ছন্দে। পারিপার্শ্বিক ঘটনা সম্পর্কে খেয়ালই নেই।

(৩)

আর এক পক্ষকাল মাত্র বাকি।

'বড় নগরীর প্রধানমন্ত্রীর জনগণের প্রতি ভাষণ' অনুষ্ঠিত হবে। পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রী হলেও ভূস্বামীর অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা তাঁর। তিনিই আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত বড় নগরীর

ভ্রম

সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান পুরুষ। তিনি বর্তমান ভূস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু সহোদর নন। তিনি এককালে নগরীর প্রথম উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু মনেপ্রাণে যুদ্ধব্যবসায়ী হওয়ায় সংসারধর্ম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ফলে শরীরগতভাবে দুর্বল দ্বিতীয় পুত্র ভূস্বামীরূপে নির্বাচিত হয়েছেন।

শুধু যুদ্ধপ্রেমী নাকি অন্য কোনো নিঃগ্রুঢ় কারণ...

সবে মালয় দেশ অধিকার করে বহুদিন বাদে ফিরেছেন তিনি। তারই বিজয়োৎসব এই অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষ্যে চলছে জোর প্রস্তুতি। মঞ্চের নকশা চূড়ান্ত করেছে উপপরিষদবর্গ। সূর্য্যরথের আকৃতির মঞ্চ তৈরী করা হবে। মঞ্চের উচ্চতা হবে পাঁচ মানুষের সমান। সম্মুখে দশ সহস্র অতিথির আসন থাকবে। প্রবেশ পথ আলাদাভাবে সাজানো হবে। সারা নগরীর মহাসড়কে মানব উন্নয়নচিত্র শোভা পাবে।অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠামাধ্যমে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনই প্রকৃত লক্ষ্য। অত্যন্ত কঠোর এই স্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।এই সমস্ত অনুষ্ঠানে নারীর প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

দূরে পাহাড়ের টিলার ওপর ভূস্বামীর সুবিশাল প্রাসাদ। তার উপরিতলের বাতায়নে একটি মানুষ বহুক্ষণ আনমনে বসে আছেন। প্রধানমন্ত্রী দেবব্রত। সেনানায়কও। বড় নগরীর প্রাণ পুরুষ। একটির পর একটি যুদ্ধ জিতেছেন তিনি। যে কার্যে হস্তক্ষেপ করছেন সেখানেই বিজয়লাভ

করছেন। কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি নেই। বিজিত রাজ্যের মানুষদের কিন্তু অপমান অত্যাচারে জর্জরিত করেননা। স্বসম্মানে তাদের বশ্যতা গ্রহণ করেন। তবে কিসের মোহে এই যুদ্ধ পরিচালনা! কি প্রাপ্তির আশায় এত কষ্ট স্বীকার! নারী, সূরা, রাজত্ব অত্যন্ত সহজলভ্য অথচ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় তাঁর কাছে।

তিনি কি মানুষ? নাকি অতি মানব? নাকি মানুষের ভেকধারী শয়তান? কি তাঁর অভিষ্ঠ? কি তাঁর লক্ষ্য?

(৪)

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে বড় নগরী এবং ছোট নগরী বহুকাল ধরে বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। পুরুষানুক্রমে দুই নগরীর ভূস্বামীদ্বয়ের মধ্যে লিখিত চুক্তি হয় তাদের কোন সন্তানের সহিত কোন সন্তানের বিবাহ হবে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দশ বৎসর পূর্বে দুই ভূস্বামীর চুক্তি হয় বড় নগরীর প্রথম পুত্রের সাথে ছোট নগরীর প্রথম কন্যার বিবাহ সুনির্দিষ্ট কালে সম্পন্ন হবে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে বড় নগরীর ভূস্বামী জ্ঞাত হয়েছেন পূর্ববর্ণিত প্রথমা অন্য পুরুষে আকৃষ্ট। সুতরাং এ এক নিন্দনীয় চুক্তিভঙ্গ। এই কারণেই এই বিচারসভা আয়োজিত হয়েছে। সুষ্ঠ মীমাংসার প্রয়োজন। নতুবা অন্য নগরীর কন্যারাও এই অন্যায়ে নিয়োজিত হবে। একটি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশু প্রয়োজন।

ভ্রম

(৫)

গাড়ি এখনো ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে কোনো বিরাম নেই। কনিষ্ঠ ভগ্নীদ্বয় নিজের ভবিতব্য মেনে নিয়েছে। শান্ত হয়ে তারা এখন নিজেদের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত। তারা অনুধাবন করেছে চালকের আসনে আসীন মানুষটি তাদের বড় নগরীতে নিয়ে যাবে। সেখানে ভূস্বামীর পুত্রদের সাথে তাদের বিবাহ সমাপন হবে। সাথে ছোট নগরীকে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে বড় নগরীর কাছে। তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার শেষ। খাপ পঞ্চায়েতের এই ছিল রায়। এই রায় মান্য না হলে, কোনো ধরনের বানিজ্যিক বা বৈবাহিক বা অন্য কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না ছোট নগরীর সাথে। প্রকৃতপক্ষে বড় নগরীর যুদ্ধক্ষমতা, বৃত্তবৈভব, প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। তদুপরি সেখানকার ভূস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রত। তার মতো বলশালী রণনিপুন মানুষ এই কালে বিরল। সভার বিচারকদেরও নিজ নিজ রাজ্যের স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে ভয় আছে। সুতরাং পঞ্চায়েতের রায় পক্ষপাতদুষ্ট হবে তা আর অধিক কি?

দেবব্রত আজ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রায় অনুযায়ী তিনি আজ ছোট নগরীর ভূস্বামীর তিন কন্যাকে নিজ নগরীতে নিয়ে যাবেন।

সেই মতো গাড়ি দ্রুত ছুটে চলেছে ময়াল সাপের মত মসৃণ সড়কের ওপর দিয়ে। নগর শেষ হয়ে ক্ষেত। ক্ষেত

ভ্রম

শেষে কাশবন। কাশবন পেরিয়ে শালের অরণ্য। সবুজ অরণ্যের শেষে বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় অববাহিকা। শীর্ণ তমসা নদী আত্মাহুতি দিয়েছে গঙ্গার বিপুল বক্ষে। দ্বিপ্রহরের শেষে সূর্য পাড়ি দিচ্ছে পশ্চিমে। দুই নদীর সঙ্গমস্থলে কাশবন। জলের ধারার পাশে পাশে যতদূর চোখ যায় সাদা পশমের গালিচা। মনোমুগ্ধকর। বিস্তীর্ণ প্রান্তে নিশ্চল হলো দ্রুতগতি। দুটি মানুষ নেমে এলেন। দেবব্রত এবং প্রথমা...

-"কিছু কথা আছে আপনার সাথে। তাই নগরীতে পৌঁছনোর পূর্বে কিছু সময় দরকার।" দেবব্রতর নিবাত কণ্ঠ। তাঁর ভাবনার খবর কারুর কাছে নেই।

-"আপনার কথাই তো সবাই শুনছে। আমার শোনা না শোনায় কি বা পরিবর্তন হবে!" ব্যাঙ্গ ঝরে পড়ে প্রথমার কণ্ঠে।

-" আপনি জানেন, বহুকাল ধরে আমাদের দুই নগরী বৈবাহিক সম্পর্কের সাহায্যে আবদ্ধ থাকে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। ফলস্বরূপ দুই নগরীরই ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অন্য কোনো প্রদেশ আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করার সাহসও অর্জন করে না। তবু আপনি এই প্রথার বিপক্ষে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন কেন?" দেবব্রতর কণ্ঠে শুধুই কি প্রশ্ন? মনে কোন উষ্মা কি লুক্কায়িত নেই?

-"আমি কি শুধু দুই নগরীর মধ্যবর্তী সেতু? আমার নিজের কোনো মন নেই? নিজের জীবন? নিজের ইচ্ছা? একজন সক্ষম নারী হিসেবে নিজের জীবন নিজের ইচ্ছায়

অতিবাহিত করা। তা কি গর্হিত অপরাধ? আর তাই যদি হয় সে অপরাধ আমার। তার জন্য আমার সহোদরাদের শাস্তি দেওয়ার কারণ কি? তাদের বলপূর্বক অপহরণ করা হয়েছে কেন? তারা তো যথাসময়ে আপনার পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হবে। উপরন্তু আমাদের প্রানপ্রিয় নগরীর স্বাধীনতা হরণের কারণ কি? বলুন। উত্তর দিন।" প্রথমা অসহিষ্ণু।

-"এতো আমার বিচার নয়। বিভিন্ন নগর প্রধানদের রায়।"

-" অন্যদের রায়! হা হা! আপনার হস্তক্ষেপ নেই? আমাদের যদি স্থান পরিবর্তন হতো, আপনি থাকতেন আমার জায়গায়, আপনি বিশ্বাস করতে পারতেন এ কথা?" আরো তীক্ষ্ণ প্রথমার বাক্যবাণ। দেবব্রতর হৃদয়ের ঝিল একটু চলকে উঠলো কি?

-"যদি এমন হতো, আমি মনে হয় আপনাকে বিশ্বাস করতাম। কারণ আপনি আর আমি এক নই। আপনাকে অবিশ্বাস করার ক্ষমতা আমার ইহজন্মে হবে না।" অচেনা কন্ঠ দেবব্রতর।

দূরের অস্তগামী সূর্যের মতো তাঁর কণ্ঠও অস্পষ্ট শোনায়। সেখানে কোনো উষ্মা নেই, যেন এক টুকরো কাতরতার মিশ্রণ। বহুকালের পরম্পরা অনুযায়ী এই নারীই তার অঙ্কশায়িনী হিসাবে নির্দিষ্ট। বাল্যকাল থেকেই তিনি জানেন ইনিই জীবন সঙ্গিনী। এতকাল কোনো নারীর প্রতি আকর্ষণই বোধ করেননি

তিনি। শুধু শস্ত্রশিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষায় নিমজ্জিত থেকেছিলেন। অথচ আজ? মনের গহনে কি অন্য কিছুর আভাস? সে সত্য কি তিনি নিজেও স্বীকার করেন!

আজও সফল হয়েছেন তিনি। প্রতিবারের মতো। বিনাযুদ্ধে করায়াত্ত করেছেন আর একটি নগরী। এ তাঁরই রাজনৈতিক দূরদর্শিতা। তাঁরই অভিপ্রায়। আসুমদ্র হিমাচলে তা স্বীকৃত। সাথে নারীও। তবু সভার শুরু থেকে তিনি প্রতিহত হচ্ছেন এই নারীর দ্বারা, যিনি হতে চলেছেন তাঁর ভার্যা। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলে যেকোনো রমণী যেক্ষেত্রে তাঁর অঙ্কশায়িনী হতে উন্মুখ, এই নারী... এঁর সাহসে বিস্মিত হচ্ছেন তিনি। আর এই প্রতিহতি তাঁকে এক অদ্ভুত মানসিক বন্ধনে গ্রন্থিত করছে।

-" কি অভীপ্সা আপনার?" পুরুষের প্রশ্ন নারীর প্রতি।

-"আমার যা বাসনা আমি পূর্বেই ব্যক্ত করেছি। আমি অন্য এক পুরুষকে জীবনসঙ্গীরূপে নির্বাচন করেছি। বলপূর্বক আমায় অপহরণ করতে পারেন, কিন্তু আমায় আপনি পাবেন না। আত্মহননের জন্য আমার একটি অঙ্গুলীহেলনই যথেষ্ট।"

-" কে সেই পুরুষ?" গর্জে ওঠেন দেবব্রত।

-" তা আমি গোপনই রাখবো। তার কোনো ক্ষতি আমার আকাঙ্খা নয়। আপনি জানলে ফল কি পরিমান মারাত্মক হতে পারে, তা আমার অজানা নয়। আপনার কাছে শুধু প্রার্থনা। মুক্তি দিন আমায়। শুধু নারীশরীর নিয়ে কি করবেন আপনি। মুক্ত করুন আমায়।" অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠ প্রথমার।

-"যদি না দি? আমি যে সময়ে যা মন বাসনা করেছি, তাই অধিকার করেছি। আপনি তার অন্যথা হবেন, তা আশা করেন কি করে?" দেবব্রতর ওষ্ঠে অল্প হাসির রেখা।

-"তাহলে আত্মহত্যা ব্যতীত আমার কোনো উপায় রইল না। একটাই আক্ষেপ। একটি আত্মহত্যা, আর একটি হত্যা করতে হবে। আত্মজকে হত্যা..." রুদ্ধ হয়ে আসে দৃঢ় নারীকণ্ঠ।

-" আপনি জানেন কি বলছেন?" হৃদপিণ্ড অনুপলের জন্য স্তব্ধ হলো কি?

-" আমি অন্তঃসত্ত্বা।"

নিস্পন্দ দেবব্রত। নতুন নগর অধিগ্রহণ করলেন অনায়াসে। কিন্তু একটিমাত্র সভায়, কয়েক প্রহরের মধ্যে আর কি কি হারাবেন তিনি? অনেক সময় ধরে মৌন রইলেন।

-"আপনি মুক্ত।" আর একটি শব্দ ব্যয় না করে প্রস্থান করলেন দেবব্রত।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রথমা। হৃদয়ের কোনো এক তন্ত্রী এক অজানা সুরে বেজে উঠল। ধীরে ধীরে নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ইতিহাস কি এভাবেই পরিবর্তিত হয়? ...ক্রমশ ■



অপাংক্তেয়

সুভাষ মুখার্জী

শিবু ডাইনিং টেবিলের প্রসঙ্গটাকে আবার খুঁচিয়ে তুলল। "তবে যাই বলিস অপ্সরাদের ডিম্যান্ড কিন্তু দেবতাদের চেয়েও বেশি ছিল।"

এখন এদেশেও "অপ্সরা ডান্স" জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। নিউজ চ্যানেলে দেখানো এই খবরটা থেকে কথা উঠে শেষে স্বর্গীয় অপ্সরাদের কথায় আলোচনা পৌঁছে ছিল। প্রসঙ্গ চাপা পড়েছিল কথার মোড় ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাঙালী উইকেট কিপারের দিকে ঘুরে যাওয়াতে।

ধুরন্ধর বয়েজ ক্লাবের মেম্বার সেই সব বন্ধুরা অনেকেই আজ একত্র হয়েছিল বাবুয়ার বাড়ি। অঞ্চলটা গড়বাগান। হুগলী জেলার কেওটার মধ্যে পড়ে। তার বাড়িতে আজ ছুটি ফুরোনোর দুঃখে গেট টুগেদার ছিল। পেশায় উকিল বাবুয়ার কোর্ট খুলছে ভাইফোঁটার ঠিক পরেই।

জব্বর খ্যাঁটন হয়েছে। মাছের মাথা থেকে পাঁঠার ঠ্যাং কোনোটাই বাদ যায় নি। এরা একসাথে হলে নিজের বৌদের ঘরে রেখেই বের হয়। এই নিয়ে গিন্নীরা আগে অনেক ঝামেলা করেছিল। শেষ অবধি সেসব তেমন ধোপে টেকে নি।

আজও কেবল পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতিনিধিরাই "পাস পাস" চিবোতে চিবোতে ঘরে ফিরছে একসাথে। বাবুয়াও ছাড়তে এসেছে সবাইকে। ওরই হাঁটা হবে সবচেয়ে বেশি। শেষজনকে অব্দি ঘরে পৌঁছে দিয়ে রতন আর ও ফিরবে এক সাথে। তাদের বাড়ি পাশাপাশিই।

####

এখন অপ্সরা প্রসঙ্গ আবার উঠতেই ধুনো খচে গেলো: "আচ্ছা তোরা একটা কথা বলতো, এই নাচ গান শোনানোর আড়ালে ‘অন্য কর্ম’ করতে হেল্প করা অপ্সরাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল কেন?"

সকাল: কত বেশি ছিল?

ধুনো: ৩৩ কোটি দেবদেবী যখন ছিল, তো তার প্রায় অর্ধেক নিশ্চয়ই দেবী? বাকি অর্ধেক দেবতাদের খুশি করতে ৬০ কোটি অপ্সরা...

সাহেব বাধা দিলো: না রে। পুরাণের ওই ডেটাখানা মনে হয় অতিরঞ্জিত। আসলে ১০ জন দৈব আর ৩৪-৩৫ জন লৌকিক মিলিয়ে গোটা পঁয়তাল্লিশ জন মতো ছিল।

শিবু: সে না হয় হলো কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে যন্তর ছিল উর্বশীই। কিই না করেছে বাওয়া!

রতন: ওর সবচেয়ে হিট লাভ স্টোরি তো সেই রাজা পুরুরবার সাথে। কার যেন ছেলে ছিল সে রাজা?

সাহেব: বৃহস্পতির বৌ তারা আর চন্দ্রের ছেলে হল বুধ।

তার ছেলে এই পুরুরবা। আসলে দ্যাখ তলিয়ে ভাবলে ঠিক যেন মনে হয় বৃহস্পতি গ্রহের কোনো স্যাটেলাইটের সাথে মুনের কলিশনেই বুধ গ্রহের জন্ম হয়েছে। সবটাই গ্রেটার সায়েন্স।

বাবুয়া চলতে চলতেই একটা সিগারেট ধরিয়ে দু' টান সবে দিয়েছে; খ্যাক করে উঠলো: খামোখা কথা ঘুরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যাস না তো। বুড়ো বেস্পতির বৌ হয়ে থাকতে সুন্দরী তারার আর ভাল লাগছিল না। একদিন সুদর্শণ চন্দ্র তাকে দেখতে পেয়ে নিজের রথে বসিয়ে সোজা প্রাসাদে এনে তুলল। তারাও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে দিব্যি ফুর্তি করতে সেখানেই রয়ে গেল। বেশ কিছুদিন বাদে সঙ্কোচ কাটিয়ে বুড়ো চন্দ্রের কাছে এসেই পড়ল বৌ চাইতে। চন্দ্র বলল আরে অত তাড়া কিসের? একটা ছেলেপুলে কিছু হলেই ফেরত দিয়ে আসব'খন। তো সেই ছেলে হল বুধ।

দীপু হাসতে হাসতে বলল: হায়রে বুড়ো বর! বেচারার মনে কতো আঘাত লেগেছিল বল তো?

এবার সাহেব রেগে গেল: বৃহস্পতি দেবগুরু হলে কি হবে? কম বয়সে এতটাই চরিত্রহীন ছিল যে ওর সাথে এরকমই হওয়া উচিত।

টিনাই: সেকি গো? দেবগুরুর ইমেজ তো সার্কিটে খুব ভালোই!

সাহেব: অল্প বয়সে নিজের প্রেগন্যান্ট বৌদি মমতাকে দেখে বৃহস্পতির একবার সেক্স করতে ইচ্ছা জাগে। সে

তার সাথে সম্ভোগ করতে জোরজার শুরু করে। ঋষি উতথ্যের সুন্দরী স্ত্রী মমতা। পেটের ছেলের ক্ষতি হওয়ার ভয়ে প্রথমটা সে দেওরকে বাধা দেয়। তবে অনেক অনুরোধ উপোরোধে সেও রাজি হয়েই যায়। শেষ পর্যন্ত ভিতরের শিশুর পায়ে লেগে বৃহস্পতির 'আনন্দে' ব্যাঘাত ঘটে। তার সিমেন বাইরেই পড়ে যায়। তাতে দেবগুরু রেগে গিয়ে সেই দীর্ঘতমাকে পেটে থাকা অবস্থাতেই শাপ দিয়ে অন্ধ করে দেয় পারমানেন্টলি।

ধুনো সুসু করতে যাবে বলে সবাই একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়াল। দীপু বাড়ির আলাদা পথ ধরল। যেমন হয়ে থাকে; ধুনোর দেখাদেখি আরও দু'জন গেল এক নম্বর সারতে। এমনিতে কিন্তু বাড়ি গিয়েই করতো! রাত বাড়ছে, ঋতু বদলের ফলে হালকা ঠান্ডা আসছে বাতাসে।

####

ফিরে এসেই টিনাই ফের প্রসঙ্গটা ওঠাল: আচ্ছা অন্য লাইনের কথা ছেড়ে উর্বশীর লাভ স্টোরিটা একটু বল দেখি। আমি তো খালি সেই বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যাণ ভাঙানোর কথাটাই জানি। আর তার কোল্যাটারাল ড্যামেজ হিসাবে শকুন্তলার জন্মের ব্যাপারটাও।

রতন বিরক্ত হয়: এটা ক্যে বে! ওটা উর্বশী নয় মেনকা।

টিনাই: উর্বশীর গল্পটা তবে কি রকম?

সবাই জড়ো হয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলে বাবুয়া শুরু

করে: সবচেয়ে পুরোনো তথ্য অনুযায়ী উর্বশী স্বর্গে শাপগ্রস্ত হয়। তুচ্ছ কারণে মর্তে নির্বাসিত হয়।

তারই মোহে অন্ধ ছিল রাজা পুরূরবা। এই অপ্সরা দেবরাজের কাছে অনুমতি চায় পৃথিবীতে থাকার সময়টা ওই রাজার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার। অনুমতি তো মিললো কিন্তু অনেক অদ্ভুত শর্তও চাপিয়ে দেওয়া হল। তাকে একাহারি হয়ে সংযমে থাকতে হবে। তার ইচ্ছা জাগলে তবেই রাজা তার সাথে সেক্স করতে পারবে। জোরজার, অনুরোধ কোনোটাই করা চলবে না। সে রাজাকে কখনো 'নেকেড' দেখতে পারবে না। আবার একদিনে তিনবারের বেশি রাজা উর্বশীতে উপগত হতেও পারবে না। তাদের বিছানার পাশে পাহারাদারদের মতো দুটো ভেড়া বাঁধা থাকবে। যারা আবার হারালে চলবে না। এইরকম সব নিয়ম... ভঙ্গ হলেই অপ্সরা ব্যাক টু স্বর্গরাজ্য।

টিনাই: সে তো সুবিধাই ছিল! এটা যখন নির্বাসন তখন এতোগুলো ছুতোর কিছু একটা ধরে উর্বশীর তো দুদিনেই ফেরত চলে যাওয়ার কথা।

বাবুয়া: কিন্তু সেরকম না করে তারা চার বছর একসাথে আনন্দে রইল। এরমধ্যে অপ্সরা প্রেগন্যান্ট হল – আর দেবতারাদেরও তার জন্য খুব মন কেমন করতে লাগল। উর্বশী না ফিরলে আর চলছেই না। তাই দেবতারা তাকে ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন ছলাকলার আশ্রয় নিল। সফলও হল।

শিবু: বোঝো! নাচানাচি বা 'অন্য' যেকোনো কাজেই গর্ভবতী মহিলাকে তেমনভাবে দরকার পড়া তো ভালো কথা নয়!

সবাই হেসে উঠল। বাবুয়া খেই ধরলো: দেবতারা ভেড়া চুরি করল। বাজের আলোয় নেকেড রাজাকে উর্বশীর সামনে দৃশ্যমান করে দিয়ে কাজ হাসিল করে নিল। অপ্সরা বিদায় নিল। বহুদিন পর রাজা আবার তার দেখা পেল। এবার তারা দুজনে বছরে একদিন করে ডেটিং ফিক্সড করে নিল। শেষে রাজার তাতেও সাধ মিটতে চায় না। তখন গন্ধর্বদের সাহায্যে আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে পুরূরবা পাকাপাকিভাবে স্বর্গে স্থান করে নিল আর উর্বশীকেও পেয়ে গেল।

ধুনোর স্বগতোক্তি: যাক্ শেষে লোকটা লিটার্যালি প্রেমের আগুনে পুড়ে মরলো।

টিনাই আর ধুনোর বাড়ি আসায় তাদেরকে সি-অফ করে বাকিরা এগোল।

রতন: তবে একটা প্রুফ পাওয়া যাচ্ছে। রম্ভার চেয়ে মেনকার মধ্যে এক্স ফ্যাক্টর বেশি ছিল। দুজনেই ইন্দ্রের হয়ে একই মিশনে গেছিল বিশ্বামিত্রের কাছে। মেনকা সাকসেস পেলেও রম্ভার যেন কি একটা হয়েছিল!

এবার দীপু বলে: ওই তো রম্ভা মুনির ধ্যাণ ভাঙিয়ে দিলেও মন টলাতে পারেনি। বিশ্বামিত্র তাকে ১০০০ বছর পাথর বানিয়ে রেখে দেয়। তারপর একদিন আশ্রমে উৎপাত করতে আসা এক রাক্ষসকে তাড়াতে কেউ সেই পাথর ছুঁড়ে

মারে। রাক্ষস পালালেও, এক জায়গায় গিয়ে সেই পাথর তার মাথায় পড়ে। রাক্ষস খতম হয় – আর পাথরও সেখানে জলে ডুবে যায়। তাতেই রম্ভা মুক্তি পায়। কি যেন জায়গাটা?

সাহেব: কপিতীর্থ। শ্বেতমুণি বায়ব্যাস্ত্র দিয়ে পাথর দুটুকরো করে ছুড়ে মারে।

তবে রম্ভার এর চেয়েও বেশি দুরবস্থা করে রাবণ। একবার রাবণের ভাইপো নলকুবেরের স্ত্রী রম্ভা বরের সাথে আউটিং করছিল। এরকম সময় রাবণ রম্ভার রূপ, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে খুবই হর্ণি হয়ে পড়ে। জোর করে তাকে রেপ করে তবেই ক্ষান্ত হয়। নলকুবের কিছু করতে না পেরে রাবণকে অভিশাপ দেয়। ভবিষ্যতে এরকম কান্ড ঘটালে রাবণের মাথা ৭০ খন্ড হয়ে যাবে।

বাবুয়া: হেইঃ কি আলফাল বকছিস? ৭ টুকরো আছে তো!

সাহেব: আরে কোন মাথাটা তা তো বলা নেই? দশটা মাথার সাত টুকরো করে হলে...

হাসির ধুম ওঠে।

রতন: আচ্ছা গুরু স্বর্গের সুন্দরীদের নিয়ে তো তোমার হেব্বি জ্ঞান। তুমি এই রম্ভার সামনে পড়লে কি করতে?

সাহেব সভয়ে বলে: কি জানি তখন আর জ্ঞান ট্যান থাকতো কি না! ওসব দেব দেবীদের ব্যাপার। আহা যদি একবার সামনে দেখতে পেতাম, তাতেই জীবন ধন্য হয়ে যেতো।

আরেকটা মোড়ের মাথা উপস্থিত। এখান থেকে শিবুর আর সাহেবের বাড়ি কাছেই। চারজনে তাই এখানেই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গ্যাঁজাবে এবার। শিবু বাবুয়াকে আরেকটা সিগারেট ধরাতে দেখে বললো: এবার তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও দা, বৌদি এতক্ষণে খচে ফায়ার হয়ে যাবে। সাহেবদা'র তো সে অসুবিধা আপাতত নেই! সাহেব হেসে বলে: "বউ বাপের বাড়ি যাওয়ায় কিছু তো সুবিধা আছে নাকি বস?" রতনও থাকতে না পেরে একটা সিগারেট ধরায়। চোখ কুঁচকে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে: কিন্তু উর্বশীকেই তবে সব অপ্সরাদের সেরা কেন বলা হয়?

বাবুয়া: একবার নরনারায়ণ জোর তপস্যা করতে থাকেন। এতে ইন্দ্র স্বাভাবিক ভাবেই পদচ্যুত হওয়ার ভয় পেল।

সাহেব ইন্টারাপ্ট করে: এখানে দ্যাখ বোঝা যাচ্ছে বিষ্ণু তখনও প্রয়োজনীয় সুপার পাওয়ার পাননি। আবার তিনি দেবতাদের বিশ্বাসের পাত্রও তৈরী হয়ে ওঠেননি। পরবর্তীকালে তিনি সেই ক্ষমতা অর্জন করেন। আর দৈত্যদের দিকে না গিয়ে দেবতাদের পক্ষেই থাকেন, তাই তিনি তাদের বিশ্বাসভাজন হন। বাবুয়া কন্টিনিউ কর্।

বাবুয়া: হ্যাঁ তো ইন্দ্র ব্যাটা ঘৃতাচী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা, অলম্বুষা এরকম আরো সব হেভিওয়েট অপ্সরাদের পাঠায় সেখানে। নাচ গানে মন ভোলাতে আর তপোভঙ্গ করতে। তাদের জ্বালাতনে বিরক্ত হলেন নারায়ণ।

তবে তিনি তো "মিস্টার কুল," রেগে শাপ না দিয়ে নিজের উরুতে চাপড় মেরে এক সুপার গর্জাস নর্তকীকে জন্ম দিলেন। সে বেরিয়েই বাকি অপ্সরাদের চ্যালেঞ্জ জানালো। আগে আমাকে নেচে হারাও, তার পর বসের দিকে তাকিও। সবাই একে একে হেরে চম্পট দিল।

শিবু: তার মানে উর্বশী বাকিদের থেকে আলাদাও। কিন্তু সে মহাভারতে অর্জ্জুনের সাথে বড় নোংরা কাজ করে ফেলছিল এটা মানতেই হবে।

বাবুয়া কিছু বলছে না দেখে সাহেব মুখ খুললো: পুরোটা তাকে দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। ইন্দ্রপুত্র ডেমিগড অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য স্বর্গে গেলে সেখানে জোর আতিথ্য পায়। রাজসভায় উর্বশীর নাচও সে দেখেছিল। যার যেদিকে মন... ইন্দ্র তখন ছেলেকে অপলকে নৃত্য দেখতে দেখে ভাবলো বুঝি উর্বশীকে অর্জ্জুনের মনে ধরেছে। দেবরাজ চিত্রসেনকে দিয়ে উর্বশীকে নির্দেশ পাঠালো, সে যেন গিয়ে ছেলের বেড পার্টনার হয়। সেই মতো মনস্থির করে উর্বশী গেল অর্জ্জুনের কাছে। ও মা গিয়ে শোনে অর্জ্জুনের সেরকম কোনো মোটিভই নেই! বরং সে উর্বশীকে অবাক হয়ে দেখছিল কারণ তার বংশ এই অপ্সরার গর্ভ থেকেই শুরু হয়েছে। পৌরব বংশের আদিপুরুষ পুরূরবার মাধ্যমে। অর্জ্জুনের কাছে উর্বশী মা কুন্তী আর শচীর মতো। নমস্য ব্যক্তিত্ব। এত বড় একজন বীরের কাছে অনন্ত যৌবনা এক

সুন্দরী তার "বিশেষ মনোভাব" নিজের মুখে বলেছে। এখন তার মুডও হয়ে গেছে। এসময়ে তাল কাটলে কে মাথা ঠিক রাখতে পারবে বল তো? স্টার প্লেয়ার রিজেক্টেড হয়ে রাগের মাথায় নাতিকে "ইম্পোটেন্সি" আর "ইরেক্টাইল ডিসফাংশন" এর অভিশাপ দিয়ে ফেললো। যদিও পরে উর্বশী নিজের ভুল বুঝতে পারে। সে অভিশাপ মডিফাই করে এক বছরে কমিয়ে আনলো। তাতে পরে অর্জ্জুনের অজ্ঞাতবাসে সুবিধাই হয়েছিলো।

####

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ঝিঁঝিঁ'র ডাক শোনা যাচ্ছে। দূরে কোথাও কুকুর ডাকলো।

সাহেবই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল: একটা কথা আমরা আগে স্কিপ করে গেছি। উর্বশী আর পুরূরবার কাহিনী তৈরী হওয়ার পিছনে আরেকটা কাহিনী আছে। স্বর্গে বরুন আর মিত্র বলে আরেক দেবতা সবসময় একসাথে ঘোরাফেরা করতো। এরা একবার উর্বশীকে দেখে থাকতে না পেরে তার সাথে সেক্স করতে চায়। উর্বশী তাতে রাজি হয়নি। কিন্তু সে ব্যাটাদের তখন এমন অবস্থা যে রেতঃস্খলন আটকাতে পারে না। এতে রেগে গিয়ে তারা শাপ দেয় এবার তুমি কেবল মানুষের সাথেই সেক্স করবে। এরই মাঝে রাজা পুরূরবা একবার স্বর্গে ইনভাইটেড হয়। উর্বশীর নাচের সময় চার-চোখ এক হলে অপ্সরার তালভঙ্গ হয়।

ফলে কপালে জোটে পৃথিবীতে নির্বাসনের আদেশ। পরের ঘটনা তো আলোচনা হলোই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়েই বাবুয়া লাফিয়ে ওঠে, "মেয়েটা আমার ঘুমিয়ে পড়ল বোধ হয়। আজ বৌয়ের হাত থেকে নিস্তার নেই।" রতনও বাকি দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে বাবুয়ার সাথে ফিরতি পথ ধরল।

####

শিবু সাহেবকেও গুডনাইট উইশ করতে গেলে সাহেবের মাটিতে দেখতে থাকা চোখের দিকে লক্ষ্য পড়ল। সে বলল: কি ব্যাপার বলোতো সাহেবদা! এই টপিকটা আমরা সবাই এতো মজা করে আলোচনা করছি আর তুমি থেকে থেকেই অমন হয়ে যাচ্ছ কেন?

সাহেব গলাটা পরিষ্কার করে নেয়: দ্যাখ অপ্সরাদের আমরা সাধারণত স্বর্গের বেশ্যা বলেই ভাবি। সমুদ্র মন্থনের সময় "স্ত্রী রত্ন" রূপে এদের আবির্ভাব হয়। কিন্তু নির্লজ্জের মতো দেবতা আর দৈত্য দুই পক্ষই তাদের গ্রহন করতে অস্বীকার করে দিল। তাদের দলে এদের কোনো জায়গা নেই। এরকম অবস্থায় এরা সাধারণ মানুষে পরিণত হতো। কিন্তু ত্রিদেবের কেউই তা সহ্য করেননি। নারায়ণ তাদের অনন্ত যৌবন আর রূপ পরিবর্তনের শক্তি দেন। শিব সরস্বতীর সাহায্যে তাদের নাচ-গানে অতুলনীয় করে তোলেন। গন্ধর্বদের সঙ্গিনী হওয়ারও স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাদের। আর ব্রহ্মা দেবতাদের

অর্ডার দেন এদের দেবলোকে স্থান দিতে। মনোরঞ্জনের আড়ালে তারা হল স্বর্গের সেই বিশেষ অস্ত্র – যা দিয়ে বিনা যুদ্ধে থ্রেট টার্মিনেট করা যায়। এবার বুঝতে পারছিস স্থূলবুদ্ধিতে এদের প্রস্টিটিউট বলে তাচ্ছিল্য করলে তা খুব মজা লাগার কথা কি?

####　　　　####　　　　####

শিবু চুপচাপ বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালো। সাহেব তখনো ফাঁকা চৌমাথায় আধো অন্ধকারে মাথা নীচু করে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে... ■

শেষ প্রান্ত

সুচিতা সরকার

কোথায় আছি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। চারিপাশটা, বেশ অন্ধকার। ওপরের পানে চেয়ে দেখলাম গাঢ় নীল আকাশের গায়ে একাদশীর চাঁদ জ্বল্ জ্বল্ করছে, সাথে আছে তারাদের দল। কোথাও কোনো মেঘের চিহ্ন নেই। সামনেই হয়ত পূর্ণিমা আসছে। চোখ নামিয়ে আবার দেখার চেষ্ঠা করলাম, এবার খানিকটা পরিস্কার লাগছে। হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি ! এটা তো বাড়ির উঠোন।

কত বছর পর আবার এতো কাছ থেকে দেখছি। ছাদ থেকে বেশ অন্যরকম লাগতো। উঠোনের পরিধিটা একটু কমেছে বটে, কিন্তু এই দিকটা একই রয়েছে। জবা, কাঠমালতি, পাতাবাহার, লাল-হলুদ-কমলা রঙের রকমারি ফুলের সবকটি গাছ নিজ নিজ জায়গায়তেই দাঁড়িয়ে। আর রয়েছে সেই বেলী ফুলের গাছটিও। এই রাতের অন্ধকারে শুভ্র মতির মতো চক্ চক্ করছে বেলীফুলগুলি। সুগন্ধে আশপাশটা ভরে আছে।

এই ফুলটা বরাবরি আমার খুব প্রিয়। দাদুর কাছে এক সময় বেশ বকাও খেয়েছি এই গাছে হাত দেওয়ার জন্য। বারান্দার গোল সিঁড়িটার গা বেয়ে বেলীফুলের গাছটা ছিল। কালের সাথে রাস্তা উঁচু

হয়েছে, তার সাথে তাল মিলিয়ে উঠোনটিও উঁচু করা হয় আর সাধের গোল সিঁড়িটা মাটির নীচেই চাপা পড়ে যায়। মনে হচ্ছে, আমি ঠিক ওই গোল সিঁড়ির ওপরেই বসে আছি। কি অদ্ভুত ভাবেই আজ ছোটো ছোটো প্রিয় জিনিস গুলোকে এতো কাছে পাচ্ছি। মনটা খুব ভালো লাগছে।

কিন্তু, এটা কে? আমার সামনেই শুয়ে আছে, কে এটা? চাঁদের আবছা আলোয় মুখটা তেমন বোঝা যাচ্ছে না। এতো রাতে এই উঠোনে এভাবে কেন শুয়ে আছে? রাস্তার কোনো ভিখারি না তো? পরনের শাড়িটা দেখে খুব চেনা লাগছে। ঠিক এরকম একটা নীলচে শাড়ি তুমি আমায় শেষ বারের পুজোয় দিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে, আমাকে নীল রঙে ভালো মানায়। ভেবেছিলাম, সেদিন পড়ব শাড়িটা, যেদিন তোমার সাথে দেখা হবে আবার।

এই দেড় বছরের ব্যবধানে সব কিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। যে তুমি, জীবনে চলার পথের ক্ষুদ্র থেকে অতি ক্ষুদ্র বিষয়গুলি আমায় বলতে, তোমার ইচ্ছে, স্বপ্ন, আমার চোখে এঁকে দিতে, ছোট বড় সিদ্ধান্তগুলি আমার হাত ধরেই নিতে, সেই তুমি শুধু অপরাজিতাকে বিয়ে করার পদক্ষেপটা ওর সাথেই নিয়ে নিলে। হ্যাঁ! আমি পারতাম বিয়ের আসরে গিয়ে তোমার প্রতি আঙুল তুলতে। রাশি রাশি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে তোমার দিকে। চাইতে পারতাম আমার ভালোবাসার দাম তোমার কাছে। কিন্তু, চাইলেই কি ভালোবাসা পাওয়া যায়, তোমায় আমি পেতাম কি ঠিক আগের মতন করে? তুমি যে

প্রেম

বদলে গেছিলে গো। তোমার কথা, তোমার চাওয়া, তোমার ভালোবাসা - সবটাই অন্য কারোর হয়ে গেছিল। হয়ত, তোমার কাছে আমার উপস্থিতি ছিল কোনো বাক্সে বন্দি স্মৃতি বা কোনো গভীর সাগরে নৌকোডুবির মতো।

তোমার নতুন পথচলা আমার রাস্তাটা কিন্তু পাল্টাতে পাড়েনি কোনোদিন। আমি ছাড়তে পারিনি তোমায় ভালোবাসতে, ভুলতে পারিনি তোমার অপেক্ষা করতে। যদি কোনোদিন ফিরে চাও কোনো অজুহাতে বা কোনো প্রয়োজনে। চাইনি তুমিও কষ্ট পাও আমার মতন করে, তাই আমি রয়ে গেছিলাম তোমার দেওয়া একলা ঘরেই।

গতকাল জানলাম, তুমি একটি পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছ। তুমি ফেসবুকে লিখেছ, তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ, মুছে পুরোনো সকল পদচিহ্ন গড়বে এবার নতুন পথ, সাথে তোমার স্ত্রী অপরাজিতা। বুঝলাম, আমার প্রয়োজন এবার ফুরিয়েছে।

চোখটা ঝাপসা হয়ে উঠেছে। আশপাশটা ঘোলাটে লাগছে। আকাশের পানে চাইলাম। ভোরের আলো ফুটছে। সামনের শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে চোখ পড়তেই বুকটা কেঁপে উঠল। সূর্যের প্রথম আভায় মানুষটির মুখটি পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। এ কাকে দেখছি! কাকে! এএএঁ... এতো আমি! নিজের পাশেই বসে নিজে। হাতের মুঠোয় তোমার দেওয়া নুপূরটা, শক্ত করে আঁকড়ে ধরা রয়েছে এখনও। দু-চারটি কাক এসে পাশে বসেছে। একবার আমার দিকে, আর একবার পড়ে থাকা মানুষটির দিকে দেখছে বারবার। হয়তো সাদৃশ্য খুঁজে বের

করতে চাইছে ওরা। বুকের ভিতরটা কেমন মোচর দিয়ে উঠছে বার বার। শরীরটা বড্ড হালকা হয়ে আসছে। হঠাৎ কাঁধে একটি শক্ত হাতের অনুভবে সম্বিত ফিরে পেলাম। কার হাত এটা, দেখব বলে মুখ তুলেছি, তক্ষুনি, গম্ভীর আওয়াজে সে পেছন থেকে বলল, "বাড়ির সবাই এদিকে আসছে। আমাদের উপস্থিতির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। চল, এবার যেতে হবে।"

উঠে দাঁড়িয়ে, একটিবারের জন্য ফিরে চাইলাম নিজের পড়ে থাকা কায়ার পানে। আসন্ন সমাপ্তিটা ভুলে গিয়ে, শেষবারের মতো তোমাকে একবার দেখার আশায়, শেষ পর্যন্ত চোখটা আমার খোলাই রয়ে গেল।

কিছু শরীর কথা বলে যায়,
কোনো গভীর রাতের ইশারায়,
আমি একলা শুয়ে শয্যায়,
শরশয্যায়...

আমি তোমার ভালোবাসা চাই,
তাই তোমায় ভালোবেসে যাই,
বলো আমার এমন চাহিদায় কি
মন দেওয়া যায়...
জীবন দেওয়া যায়... ■

ফিরে পাওয়া

অনির্বাণ বিশ্বাস

মায়ের গলা – "কিরে ওঠ, ওঠ বাবা। দেখ কারা এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে! শুয়ে থাকিস্ না। ওঠ বাবা, সবাই ক-ত দূর থেকে এসেছে। একবার চোখ মেলে তাকা – উঠে দেখা কর। আর ক-তো শুয়ে থাকবি? ওঠ, ওঠ না বাবা..."

বহুদূর থেকে যেন আওয়াজটা আসছিল। কিন্তু সোমকের এত ঘুম পাচ্ছিল যে কিছুতেই সে উঠতে পারছিল না। আসলে শরীরটা ভাল লাগছিলনা।

মায়ের ক্রমাগত ডাকাডাকিতে, সে খুব বিরক্ত হয়ে শেষে অতি কষ্টে উঠে বসল। চোখটা কচলে সামনে দেখল তার মা হাসছে।

চারিদিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। ভারি ঝলমল করছে। মা তাকে ডেকে সামনের দরজার দিকে দেখাল – "চল, দেখ সবাই তোকে দেখবে বলে বসে আছে। আয়..."

সে মায়ের সঙ্গে দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখল – আরে সামনে তার বড় পিসি দাঁড়িয়ে। এই পিসি ওকে খুব ভালোবাসে।

পিসি ওকে জড়িয়ে ধরে বলল – "কেমন আছিস বাবা? কত্তদিন পরে তোকে দেখলাম।"

ওরও বড় ভাল লাগছিল।

পুনর্জীবিত

–"কি রে কেমন আছিস??" – ও সামনে তাকিয়ে দেখে – "আরে ছোটদিদা তুমি! কেমন আছ গো? তোমার শরীর এখন ভাল?"

– "খুব ভালো আছি রে, কোনো কষ্ট নেই।" – হেসে ছোটদিদা বলল।

– "সোমক দাদু কেমন আছ? দাদুভাই শরীর কেমন আছে এখন?" – ও দেখে সামনের চেয়ারে বসে তার দাদু। ও আর থাকতে পারলনা। দৌড়ে গিয়ে দাদুকে জড়িয়ে ধরে বলল – "ভালো আছি গো, কোনো কষ্ট নেই।"

– "এই সেই সোমু, ছোটবেলায় বলত আমি কি আইসক্রিম নাকি যে গলে যাব? বাব্বা কত দিন পরে দেখা হল। ভাবা যায়!" – টুম্পামাসী বলল।

– "আরে তুমিও এখানে!" – সোমক অবাক হয়ে হাসল।

অনেকদিন বাদে আবার সবার সঙ্গে দেখা হল। তার খুব আনন্দ হচ্ছিল। সবাইয়ের সাথে পুরোনো কতো গল্প হচ্ছিল। এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে! হঠাৎ – "বাপি বাপি, বাপি গো" – বলে কে যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে মনে হল। সোমক তার মাকে বলল – "মা, মাম্পির গলা না? ও কি ডাকছে আমায়? ও এখানে আসছেনা কেন?"

সবাই এক লহমায় যেন চুপ করে গেল। মা গম্ভীর ভাবে বলল – "বাবা, এখানে সবাই তো আসতে পারেনা। ও এখন এখানে আসতে পারবেনা।"

পুনর্জীবিত

সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতে যাবে, হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। তার তো সিভিয়র অ্যাটাক হয়েছিল। আর এঁরা সবাই তো অনেকদিন আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাহলে সেও কি? সে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, সবাই তার দিকে চেয়ে হাসছে? তার সব কিছু গুলিয়ে যেতে লাগল।

সোমক হঠাৎ বলল – "আমি মাম্পির কাছে যাবো।" – এই বলে সে যে দরজা দিয়ে এসেছিলো সেদিকে দৌড়লো। তার হঠাৎ মনে হল ঘরে পা দিতেই সে অনেক উপর থেকে পড়ে যাচ্ছে। সে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছিলনা। সে ভয়ে চীৎকার করে উঠল।

"বাবা, বাবা, তুমি ওঠো বাবা" – সোমক এবার যেন খুব কাছ থেকে মাম্পির কান্না মেশানো গলার আওয়াজ পেলো। তার সারা শরীরে একটু কষ্ট হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সে চোখটা খোলার চেষ্টা করে হাফ খুলতে পারল। "ডাক্তারবাবু, বাবা চোখ একটু খুলেছে। দেখুন তাড়াতাড়ি।" – মাম্পি মানে সোমকের মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ডাক্তার বাবুকে নার্স বললো – "স্যার, পেশেন্ট ইজ রেসপণ্ডিং। হার্ট বিট ইজ গেটিং ওয়েল।"সোমককে ঘিরে ডাক্তারবাবুরা ট্রিটমেন্ট করতে লাগলেন।

সোমক দেখল তার মেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে চোখের জল মুচছে... ■

দৈনন্দিন

প্রণব কুমার বসু

কনুইয়ের গুঁতো
খেয়ে
শুরু হয়
চেঁচানি।
অপেক্ষায় আছি আমি
হবে নাকি প্যাঁদানি...

রাতভর ঘুম নেই
করি শুধু ছটপট
উনি বাবু উঠে পড়ে
ভোর থেকে খটখট...

সারাদিন ধরে খাটা
নেই কোনও রবিবার।
বলি – করো ঝাড়-মোছ
ছোট এক পরিবার...

মোবাইল হাতে নিয়ে
দিনভর ঘাঁটবে,
মনে হয় মাঝে মাঝে
এই বুঝি চাটবে...

আমার যে কত জ্বালা
কীভাবে তা বোঝাব,
মোবাইল ভূতটাকে
কী করে যে নামাব?

ফোন নিয়ে চ্যাট করে
মহিলার সঙ্গে।
আছে নাকি কত ফ্রেন্ড
শুধু এই বঙ্গে...

আমি যদি হাতে ধরি
মোবাইল কখনও,
লাফ দিয়ে ঘাড়ে ওঠে
ভালোবাসা তখনও। ■

আত্মপরিচয়

কেকা দাস

আমি তনুর মা, তনু মানে অতনু আমার একমাত্র ছেলে। ত্রিশ বছর আগে, তনু যখন জন্মায়নি তখন ছিলাম অসীমের বউ। অসীমের বউ হবার আগে ছিলাম হারানবাবুর ছোট মেয়ে। আমার নামটা যে অমিয়া সেটা স্কুলের সার্টিফিকেট আর বন্ধুদের ডাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো।

পার্টি করার সুবাদে বাবার পাড়াতে বেশ নামডাক ছিলো, অর্থ না থাকলেও প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চমাধ্যমিক পাস করার পরে অর্থের অভাবেই হোক বা বাবার অমতের জন্যেই হোক আমার কলেজে পড়া হয়নি। মা চেয়েছিলেন খুব যাতে কলেজটা অন্তত পাস করতে পারি, কিন্তু বাবার নির্লিপ্ততা সেটা হতে দেয়নি। অবশ্য পড়াশুনায় যে আমি খুব কমজোর ছিলাম তা কিন্তু নয়।

সুন্দরী হবার সুবাদে দুই দিদির পাড়ার দুই উঠতি নেতার সাথে বিয়ে হয়, সেখানেও অর্থ নেই কিন্তু প্রতিপত্তি আছে। মা বাবার বেশি বয়সের সন্তান আমিও সুন্দরী হবার দরুন পাড়ার উঠতি নেতার চোখে যেমন পড়েছিলাম, তেমনি পাড়ার ভালছেলে বলে যার খুব নামডাক – সেই অন্তুদাও আমায় প্রেম নিবেদন করেছিল। অন্তুদাকে আমিও খুব

ভালবাসতাম, দুজনের পথে ঘাটে ইশারা ছাড়া সামনাসামনি খুব কম কথা হতো।

হঠাৎ ধূমকেতুর মত পিসির দেওরের ছেলে আত্মীয়ের এক বিয়ে বাড়িতে আমায় দেখে পছন্দ করে ফেলল। পিসির মামাতো দেওর বেশ পয়সাওয়ালা, ছেলে ব্যাবসা করে, তিনতলা বাড়ি। এমন পাত্র পেয়ে বাবা আর দেরি করেননি, আমার অসীমের সাথেই বিয়ে হয়ে গেল।

অসীমরা দু'ভাই, অসীম আর আলোক। আলোক পড়াশুনো করে বাংলার বাইরে চাকরি করে, আর সেখানেই এক সহকর্মিণীকে বিয়ে করে বেশ আছে।

বাবার কাছে আর্থিক স্বচ্ছলতা না পেলেও খুব শান্তিতে ছিলাম। এখানে অর্থের প্রাচুর্যের সাথে বড্ড অস্বস্তিময় পরিবেশ। ব্যাবসার লোকের আনাগোনা, শ্বশুর মশাইয়ের আর স্বামীর রাত বাড়লেই মদ্যপানের আসরে মুখরোচক খাবার পরের পর বানিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া, হৈ হুল্লোড়... কেন জানিনা মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।

শাশুড়ি মা মুখ বুজে করতেন, আর চাইতেনও আমিও যেনো তাই করি।

আমার দিদিরা অস্বচ্ছল হলেও শ্বশুর বাড়িতে যথেষ্ট সম্মান পেত। বাড়ির বউ বলে কেউই হেলা-ফেলা করতনা, আর এ বাড়িতে ঠিক উল্টো...

বৌরাও যে মানুষ এ কথা শ্বশুর, স্বামী দুজনেই ভুলে যেতেন।

হালচাল

দেওর যখন কোন পালা পার্বনে বাড়ি আসত, ওর বউ মধুরিমা আমায় বলত – দি'ভাই এসব কিভাবে সহ্য করো! মুখ ফুটে কেনো প্রতিবাদ করনা?

আমি ওকে বলতাম – ওগো আমি যে তোমার মত বড় ঘরের মেয়ে নই। অত লেখাপড়া করিনি, ওদের মতে না চললে বাড়ি থেকে বের করে দিলে বাবার খুব সম্মানহানি হবে।

ও বলত – দি'ভাই ঘরে বসেও দেখো না কিছু করতে পার কি না... ভীষণ দরকার গো আমাদের মেয়েদের আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হবার...

বুঝতাম ও আমার অবস্থা দেখে এমন বলছে। কিন্তু আমি ভীষণ ভাবে অপারগ ছিলাম।

দিদিদের সঙ্গে বা বাবার বাড়িতে তেমন যোগাযোগ রাখতে শ্বশুর মশাই দিতেন না।

দু' বছর পরে, কোল আলো করে ছেলে হলো, ভাবলাম – একে আমি মানুষের মত মানুষ করব।

বড্ড আশা ছিল তনুকে নিয়ে, পড়াশুনোতে বড্ড ভালো ছিল। তবে বড্ড আত্মকেন্দ্রিক ছিল, নিজেকে ছাড়া কাউকে চিনত না।

বাবা ঠাকুর্দার প্রশ্রয়ে ভালোমানুষ আর হোল না। ওর বাবার আমার প্রতি উপেক্ষা দেখে ওও তাই করত। তনু আমার বড় চাকরি করে, কিন্তু তেমনি উশৃঙ্খল।

তনুর বিয়ের কথা চলছিলো, এমন সময়ে একদিন হঠাৎই মাঝরাতে অসীম চলে গেল। দুঃখের সাথে সাথে

সত্যি সত্যি আমায় স্বস্তিও দিয়ে গেল। আর পারছিলাম না ওর অবহেলা, দুরাচার সব সহ্য করতে, ভাবলাম মরে গিয়ে তো আমায় শান্তি দিয়ে গেলো।

শাশুড়িমা তখনও বেঁচে, একদম বিছানায়, এক বছর হতেই তনু বিয়ে করল, মেয়েটির অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে। রূপকথা আমাদের সেকেলে বাড়ি একদম পছন্দ করল না। শাশুড়িমা আজ যায় কাল যায় অবস্থা, এমন অবস্থাতে রূপকথা বলল – বাড়ি প্রোমোটারকে দিয়ে দাও, কাকুমণির সাথে কথা বল। আমি এমন বাড়িতে এরকম রুগীর সাথে থাকতে পারব না।

শাশুড়ি মা চলে গেলেন, উনিই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন, আমি অথৈ জলে পড়লাম। রূপকথা তনুকে বলল – বৃদ্ধাশ্রম দেখো... তোমার মাকে সেখানে পাঠিয়ে, এ বাড়ি বিক্রি করে দাও। আমার বাপির দেওয়া রাজারহাটের ফ্ল্যাটে চলো, আমরা চলে যাই।

তনুকে বড় করতে পেরেছিলাম কিন্তু ওই যে মানুষ করতে পারিনি, তাই আজ আমি এই 'অবসর' নামক বৃদ্ধাশ্রমে।

– অমিয়া... অমিয়া... অমু কোথায় তুই? কি করছিস এখানে বসে?... আবার বুঝি বাড়ির কথা ভাবছিস? আমরা বুঝি তোর পর! নে নে চল চল আজ রেখাদি ফেসবুক থেকে একজন লেখিকার গল্প পাঠ করে শোনাবে। তাড়াতাড়ি চল...

বাস্তবের মাটিতে ফিরে এসে আমি ওদের সাথে গল্প শুনতে চললাম। এখানে কেউ আমায় কারোর মেয়ে, কারোর বউ বা কারোর মা বলে চেনেনা। এখানে আমি অমিয়া বা অমু হিসেবেই পরিচিত।

বড্ড ভাল লাগে জানেন – যে নামটা স্মৃতির অতলে ছিল তার আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে একাকীত্বে ভুগছিলাম – আর এখানে পঁচিশজন দিদি বোনেদের পেয়ে অসম্ভব আনন্দে আছি। এখানে আমি শ্বাস নিই নির্ভয়ে, আর তনুকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করি এমন একটি সুন্দর আশ্রয়ের ঠিকানা দেবার জন্যে... ■

ভোরের স্বপ্ন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

দূর পাহাড়ের ওপার থেকে হাতছানি দেয় অজানা...
অনেক দূরে অথচ কাছের, যেন কত জন্মের চেনা।
এই বুঝি জন্মান্তরের অনুভূতির দহন!
এই বুঝি বিচ্ছিন্ন ভাবনার অপমরণ!

হরিণীর ছদ্মবেশে ছুটে আসে এক নারী,
আমাকে গ্রাস করে তার লোকানো কস্তূরী।
এই বুঝি সঘন প্রেমের নিগুঢ় অনুভূতি!
এই বুঝি অবচেতনার স্বচ্ছল চরৈবেতি!

অরণ্য রঙিন – যেন তার আবেগে সজীব নবীনতা...
আকাশ অমল, থেমে গেছে মেঘেদের ব্যস্ততা
এই বুঝি মহা মিলনের সন্ধিক্ষণ! মহা বিরহের অবসান!
এই বুঝি পাপঘ্ন মনের চিরাকাঙ্ক্ষিত মহাজাগতিক
পুণ্যস্নান! ■

লেখকদের প্রতি আবেদন

আপনারা ফটো পাঠানোর সময় খেয়াল রাখুন, আমাদের যথাযথ ফটোর সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই।

বীরাঙ্গনা

শরণ্যা মুখোপাধ্যায়

বড্ড ভয় লাগে আনন্দীর। তন্ময় স্যারের কোচিংটা রাত করে শেষ হয়। আজ আবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগের শেষ ক্লাস ছিল। প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। এখান থেকে কলুটোলার পুরোন মোড়ে পৌঁছতেই মিনিট কুড়ি লাগবে। তারপর, ফাঁসীবটতলাটা পেরিয়ে তাদের বাড়ি আরো মিনিট পনেরো।

ওই ফাঁসীবটতলাটাই ভয়ের জায়গা। বাবা বেঁচে থাকতে কত গল্প শুনেছে সে, ওই জায়গাটা নিয়ে। এখানে দুই বিপ্লবীর ফাঁসির ঘটনার থেকেই জায়গাটার এইরকম নাম।

সালটা বোধহয় বিয়াল্লিশ। তখন এই অঞ্চল পুরোদস্তুর গ্রাম। এখানকারই গৃহবধূ, হেমাঙ্গিনী আর ব্রজাঙ্গিনী, তারা সম্পর্কে দুই বোনও বটে, যোগ দিয়েছিল স্বদেশীদের দলে।

অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাথুসকে মারে দুইবোনে। কিন্তু পুলিশ ধরে ফেলে তাদের। এই ফাঁসীবটতলাতে প্রকাশ্য দিবালোকে, সকলের সামনে বিবস্ত্র করে চলে পাশবিক অত্যাচার। শুধু ইংরেজরাই নয়, দুই ভারতীয় অফিসারও ছিল এর মধ্যে।

ব্রতী

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে আনন্দীর। তাদের ফাঁসীতে ঝোলান হয়েছিল এখানেই। ইতিহাস মনে রাখেনি তাদের কথা, কিন্তু আনন্দীর মনে আছে। এখন এই জায়গাটাই আড্ডা হয়েছে কানা পল্টুদের। চার-পাঁচটা ছেলে দলপাকিয়ে নেশা করে, অশ্রাব্য মন্তব্য করে তাকে দেখলেই।

ফাঁসীবটতলাটার পাশ দিয়ে যেতেই ওড়নায় টান পড়ল আনন্দীর। পল্টু! প্রচণ্ড ভয়ে সিঁটিয়ে পিছু হটতে আরম্ভ করেছে আনন্দী। চোখে রাক্ষসের খিদে নিয়ে এগিয়ে আসছে পল্টু আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা। হঠাৎ ওদের গলায় ফাঁস পড়ল, শাড়ীর ফাঁস। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল চারজনই।

আনন্দীর আশ্চর্য্য চোখের সামনে ভেসে উঠল দুই জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি, হেমাঙ্গিনী আর ব্রজাঙ্গিনী, দেশ স্বাধীন হলেও যাঁদের কাজ আজও ফুরোয়নি। ■

সনির্বন্ধ অনুরোধ

পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতায় আমরা গুঞ্জনের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছি। তাই আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু শুধু পড়লেইতো চলবেনা, গুঞ্জনেকে আপনার মনের মত করে সাজাতে হলে, আপনার মতামত আমাদের দফতর পর্যন্ত পৌঁছানো একান্ত জরুরি। সুতরাং আপনার মূল্যবান মন্তব্যগুলি লিখে আমাদের ই-মেলে পাঠিয়ে দিন।

আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com